রক্তকমল

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রাপ্তিস্থান :
মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

-তিন টাকা—

৬১৬৫
RARY

১০.৩.৬১

শ্রীমণীশচন্দ্র চবক্রর্তী কর্তৃক পি ২১, বেণী ব্যানার্জি এভিনিউ, কলিকাতা ৩১ হইতে প্রকাশিত এবং কালিকা প্রেস (প্রাঃ) লিঃ ২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত

অবধূতের

করকমলে-

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিপ্লব বা সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে নানাসময়ে নানা কাহিনী রচনা করি, সেগুলি এতকাল নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। দু'একটি ইতিপূর্বে কোন কোন বইতেও প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে সেগুলিকে একত্র ক'রে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশ করা হ'ল। 'একরাত্রি' গল্পটি একেবারে প্রথম বয়সের রচনা। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যে কিছু গোলমাল থাকা বিচিত্র নয়। শেষের বড় গল্পটি ইতিপূর্বে আর কোথাও, এমন কি কোন সাময়িক পত্রেও বেরোয় নি। ইতি—

—গ্রন্থকার

রক্তকমল

সিপাহীবিদ্রোহের আগুন যখন ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে তখনও শ্রীনানা ধুন্ধুপন্থ বা নানা সাহেব তাঁর মন স্থির করতে পারেন নি। প্রথম আগুন জ্বলেছে বাংলা দেশে—মার্চ মাসে। তারপর এপ্রিল গেছে, মে গেছে—তখনও নানা সাহেব ইংরেজদের বন্ধু সেজেই বসে আছেন। ১০ই মে মীরাটে, ১১ই দিল্লীতে আগুন জ্বলল—২১শে থেকে ২৩শে মে'র ভেতর বুলন্দশহর, এটোয়া, মৈনপুরী সর্বত্র সে আগুন লেলিহান শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ল—তবু অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার ভাবছেন যে কানপুরে বিশেষ কিছু হবে না। আর হ'লেও—নানা সাহেব আছেন, ভয় কি! এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি যে ৩রা জুন তিনি নিজের কাছ থেকে ৫০টি সৈন্য এবং দুজন সেনানী পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্ণৌতে, লরেন্সকে সাহায্য করার জন্য।

হুইলার সাহেবের এত বড় ভুল করার কোন কারণ ছিল না। কারণ তার দুদিন আগেই পয়লা তারিখে গঙ্গার বুকের ওপর এক নৌকোতে যে বৈঠক বসে তাতে নানা সাহেব বিদ্রোহীদের কথা দেন যে তিনি তাদের দলে যোগ দেবেন, তাদের অধিনায়কত্ব করবেন—এবং তার বদলে তারা তাঁকে পেশোয়া ব'লে স্বীকার করবে! এইটেই স্বাভাবিক—কারণ তাঁর প্রাপ্য গদি যে ইংরেজরা বলতে গেলে গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েছে নানা সাহেব তা ভুলবেন

কি ক'রে ? বাজীরাও গদীচ্যুত হয়েও আট লাখ টাকা করে বার্ষিক ভাতা পেতেন। সেটাও নানার অদৃষ্টে জোটেনি। সেজন্য তিনি আজিমুল্লা খাঁকে বিলাত পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন, সেখানে নালিশ করতে, এবং সে লোকটি ওঁর সত্তর লাখ টাকা খরচা ক'রে 'শুধু-হাতে' ফিরে এসেছে। এসব কোন কথাই নানা সাহেবের বিস্মৃত হবার কথা নয়। সুতরাং তাঁর বাইরের মিষ্ট আচরণে ভোলা ইংরেজের কোনমতেই উচিত হয় নি। অবশ্য ওঁদের সে ভুল ভাঙ্গল শিগ্‌গীরই।

নানা প্রকাশ্যেই এবার বিদ্রোহীদের দিকে যোগ দিলেন। তাও প্রথমটা মনে করা গিয়েছিল বিপদের হাওয়াটা পশ্চিমমুখোই যাবে— কারণ সিপাহীরা সকলেই দিল্লীর পথ ধরেছিল, নানাও হয়ত সেদিকেই যেতেন। কিন্তু আজিমুল্লা খাঁ প্রভৃতি সবাই বোঝালেন যে দিল্লীতে বাহাদুর শা সম্রাট, সেখানে নানা সাহেবের স্থান কোথায় ? তাঁবেদার সেনাপতি মাত্র। তার চেয়ে এখানেই তিনি রাজা হয়ে বসুন—স্বাধীন পেশোয়ারূপে পেশোয়া বংশের সমস্ত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কথাটা নানা সাহেবের মনে লাগল। তিনি সিপাহীদের অনেক বুঝিয়ে, শেষ পর্যন্ত সবাইকে একটা করে সোনার বালা গড়িয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কানপুরে ফিরে এলেন—এবং ৬ই জুন রাত্রেই হুইলারের ব্যূহ লক্ষ্য করে প্রথম গোলা ছুঁড়লেন। ৭ই থেকে শুরু হ'ল রীতিমত আক্রমণ।

হুইলার সাহেব কি একটা বোকামী করেছিলেন! তিনি ইংরেজদের কোষাগার এবং অস্ত্রাগার—তোষাখানা আর তোপখানা সব কিছু ছেড়ে এক ফাঁকা মাঠে এসে মাত্র দুহাত উঁচু মাটির দেওয়াল

তুলে এক অদ্ভুত গড় বানিয়েছিলেন। ঐ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান গুদাম রক্ষকগণের ভয়ে তুলে দিয়েছিলেন পরম মিত্র নানা সাহেবের ওপর। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা এবং গোলা বারুদ সমস্ত গিয়ে পড়ল সিপাহীদের হাতে। এদের না আছে তেমন অস্ত্র, না আছে খাদ্য, না আছে পিছন দিয়ে পালাবার কোন পথ। একটি মাত্র কূয়া —তাও ফাঁকা জায়গায়। জল আনতে গেলেই শত্রুর কামান থেকে 'পুষ্প বৃষ্টি' হয়।

তবু হুইলার হতাশ হন নি। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরতে লাগল, নারী শিশু—কেউ বাদ গেল না। খাদ্য আসতে লাগল ফুরিয়ে ; একটু পরিষ্কার জল মেলে না—তবুও হার মানবেন না তাঁরা, এই প্রতিজ্ঞা।

প্রথমটা নানা ভেবেছিলেন এই দু' শ' আড়াই শ' লোক তাঁদের তোপের সামনে ফুঁয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু অত সহজে কাম ফতে হ'ল না। তখন বিপদ বুঝে তিনি অন্য চাল চাললেন। লোক দিয়ে বলে পাঠালেন যে টাকা কড়িও ও অস্ত্রশস্ত্র যদি ওঁরা সিপাহীদের হাতে সঁপে দিতে রাজী থাকেন এবং আত্মসমর্পণ করেন তাহ'লে ওঁদের নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌছবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

ইংরজেদের তখন সঙ্গীন অবস্থা। ওঁর সেই সর্তেই মেনে নিলেন। ২৬শে জুন উভয়পক্ষের কামানই নীরব হ'ল। কথা হ'ল ২৭শে ভোর বেলা ইংরেজরা এই অবরোধ ত্যাগ ক'রে নৌকোয় চাপবেন। কতকগুলি নৌকোও ভাড়া করা হ'ল, ওঁদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাতে কিছু কিছু রসদও ভরা হ'ল। কতকগুলো নৌকোয় কোন আচ্ছাদন ছিল না—তাতেও খড় এবং ঘাস দিয়ে অস্থায়ী চালা তোলা শুরু হয়ে

গেল। তিনজন ইংরেজ সেনানী গিয়ে নিজে চোখে এসব দেখে এলেন। ওধারে নানা সাহেব তাঁর তিনজন বিশস্ত অনুচর এঁদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তারা রইল জামিন হয়ে—নানা সাহেবের সদাচরণের। তার বদলে হুইলার সাহেব সেই রাত্রেই তাঁর অবশিষ্ট কামান এবং টাকাকড়ি যা ছিল সব নানা সাহেবের লোকের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

এ পর্যন্ত বেশ সহজেই কাটল।

কিন্তু গোল বাধল যখন শেষ রাত্রিতে কর্তাদের আসল মতলবটা সিপাহীদের কাছে জানানো হ'ল।

কথা ছিল কানপুরের সতীচৌরা ঘাট থেকে ইংরেজরা নৌকায় উঠবেন। এই ঘাটটিই কাছে পড়ে। কিন্তু সে সুবিধা নানা সাহেব দেখেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে এ ঘাটের দুদিকে উঁচু পাড় আছে আর সে পাড়ে আছে অসংখ্য ঝোপ-ঝাড়। ঘাটের ওপরে এক শিবের মন্দিরও আছে, সে মন্দিরেও লুকিয়ে থাকা যায়। নানা হুকুম দিলেন দু'দল সিপাহী গিয়ে এইসব ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকবে, দু একটা হাল্‌কা কামানও বসানো হ'লো জায়গা বুঝে। এছাড়া নদীর ওপারে বহুদূর পর্যন্ত—যেখানে যেখানে হতভাগ্য অসহায়ের দল আশ্রয়ের জন্য যেতে পারে সর্বত্রই—সিপাহী এবং কামান সাজানো হলো।

সিপাহীদের কিন্তু যখন জানানো হ'ল যে কাল সাহেবরা নৌকোয় চাপলেই তাদের ইঙ্গিত করা হবে এবং ইঙ্গিত মাত্র তারা কামান এবং বন্দুক চালাবে ঐসব অসহায় শরণাগত পলাতকদের ওপর—তখন বেশ একদল সিপাহী, বিশেষত ব্রাহ্মণরা বেঁকে বসল।

তারা বললে, 'এ যে বিশ্বাসঘাতকতা। এর ভেতর আমরা নেই!'

প্রথমটা কর্তারা খুব হম্বিতম্বি করলেন, ভয় দেখালেন—কিন্তু তারা অটল। সাহেবদের কথা দেওয়া হয়েছে যে নিরাপদে নৌকোয় চড়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে—সে কথা রাখতেই হবে। তারা সিপাহী, লড়াই করতেই শিখেছে—খুন করতে নয়।

তখন নানা সাহেব নিজে এলেন।

বুঝিয়ে বললেন, যে শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় দোষ নেই। তা ছাড়া ওরা বিধর্মী, ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধর্মের শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ করারও কোন কারণ নেই। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'—এই কথাটাই সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

তার পরও যখন দেখলেন যে, সিপাহীরা যথেষ্ট গলল না, তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন, নিজের গলার পৈতে দেখিয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ এবং রাজা, আমি তোমাদের বলছি এতে কোন পাপ হবে না, যদি হয় ত সে পাপের ভার আমি বহন করব! তোমাদের ভয় কি?'

এবার সিপাহীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।

ইতিহাস বলছে যে, এর পর আর কোন সিপাহী প্রতিবাদ করেনি। পরের দিন প্রত্যুষে নিরস্ত্র, আহত, শরণার্থীদের ওপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করেছে তারা, আগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে নৌকো জ্বালিয়ে দিয়েছে—এমন কি যারা সাঁৎরে পার হয়ে যাচ্ছিল তাদের পিছু পিছু গিয়ে গুলি চালিয়েছে, জলের ভেতরেই।

অতগুলি লোকের ভেতর মাত্র তিন-চার জন ইংরেজ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছিল।

কিন্তু এ কথা কি ঠিক বিশ্বাস হল ?

ভারতীয়—যারা রাজা বা নবাব নয়, যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সামান্যই—তাদের মধ্যে কি এমন কেউ ছিল না যে প্রতিবাদ করে এই নিষ্ঠুরতার, শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়ায় ?

আমার ত এ কথা বিশ্বাস হয় না।

আমি ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একজন ব্রাহ্মণ—দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ সিপাহী একজন মানল না ব্রাহ্মণরাজার এ অনুশাসন। সে প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করল তার সহকর্মীদের—তারপর একসময় হতাশ হয়ে তার হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দলের মধ্য থেকে এবং নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে বাইরের জনারণ্যে মিশে গেল।

তার নাম ?

তার নাম ধরা যাক্—দেবকীনন্দন !

দেবকীনন্দন অতিকষ্টে সিপাহী ও নাগরিকদের ভীড় থেকে বেরিয়ে এল। অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা স্থানে গিয়ে এক শিব মন্দিরের বাঁধানো চত্বরে বসে পড়ল।

আজ তার মন বড় বেশি নাড়া পেয়েছে।

আজ মনে পড়ছে ওর ছেলেবেলার কথা। ওর বাবা গঙ্গানন্দন ছিলেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, নিত্য হোম-পূজা না ক'রে জল খেতেন না। পৈতের হোমের আগুন নেভেনি কখনও—সেই আগুনেই চিতা জ্বলেছে তাঁর। তিনি কখনও মিছে কথা বলতেন না—শত বিপদে পড়লেও না। ওকে বলতেন, 'বেটা আমাদের এই কলির ব্রাহ্মণদের

সবই গেছে—আছে শুধু সত্য। এইটেকে বজায় রেখো। বাইরের লোকের সঙ্গে ত নয়ই—নিজের মনের সঙ্গেও কখনও কোন প্রতারণা ক'রো না। সে আরও বেশি মিথ্যাচরণ!'

গঙ্গানন্দন পূজাপাঠ আর ক্ষেতি নিয়ে থাকতেন। কিন্তু দেবকী-নন্দনের সে জীবন ভাল লাগেনি। সে বাড়ি থেকে চলে এসে ফৌজে যোগ দিয়েছিল।

সেই থেকেই সে সিপাহী।

সত্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক ব'লে চিরকাল সে ইংরেজ অফিসারদের প্রিয়পাত্র ছিল। কোন কোন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল এই দীর্ঘ দিনে।

আজ তার চল্লিশ বছর বয়স। সে ফৌজে ঢুকেছে ষোল বছরে। দু'যুগ হয়ে গেল সে ইংরেজদের চাকরী করছে।

বিদ্রোহ করেছিল? হ্যাঁ—বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিল ঠিকই। তার কারণও ছিল কিছু কিছু।

প্রথমত ধর্মের কথা। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজ কৌশলে তাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এই কৌশলের কথাটাতেই ঘৃণা বোধ হয়েছিল তার। দেবকীনন্দন ইংরেজদের শ্রদ্ধা করত—ওরা সহজে মিছে কথা ব'লে না দেখে। আজ সে শ্রদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তবু ত ওরা—ওদের দল শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

ওদের ৫৩নং রেজেমেণ্ট শেষ অবধি হুইলার সাহেবের ঐ মাটির গড় ঘিরে রেখেছিল—সেবা দিয়ে, বিশ্বস্ততা দিয়ে। অকস্মাৎ মতিচ্ছন্ন হল হুইলারের—একমাত্র যে সিপাহী দল বিশ্বস্ত ছিল,

তাদের ওপরই গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে তখন রুটি পাকাতে ব্যস্ত, কেউ বা সবে আহারে বসেছে—শুরু হ'ল গুলি।

সেদিন ঘৃণা—হ্যাঁ ঘৃণাই বোধ হয়েছিল দেবকীনন্দনের। এমন বিশ্বাসঘাতকতা যারা করতে পারে, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। তারা কৌশলে ধর্ম নেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

সেদিন তাই সে অপর সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজদের কোষাগার লুঠ করতে বা তাদের ওপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি।

কিন্তু আজ এ কি হচ্ছে?

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেবকীনন্দনের ঘুচেছে অনেক দিনই, সে বুঝেছে যে—এইভাবে লুঠতরাজ ক'রে কোন দল কখনও দেশ শাসন শিখতে পারে না। শুধু ত ইংরেজ নয়—সে লুঠের মোহ তাদের দিয়ে নিরীহ স্বদেশবাসীদেরও যে সর্বনাশ করাচ্ছে! তা ছাড়া পরে সে বুঝেছে যে চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ হুইলার ভুল খবর পেয়েই তাদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন, ইচ্ছা করে অনিষ্ট করেন নি। এ ক'দিন ওরা যে বীরত্ব, যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেবকীনন্দনের শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে। হ্যাঁ—রাজত্ব করার মত গুণ দিয়েই ভগবান ওদের পাঠিয়েছেন।

সেই লোকদের কাছে শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা?

না, শুধু সিপাহী কেন—যে কোন জোয়ান হাতিয়ার ধরতে

প্যারে—তার পক্ষেই এ কাজ চরম লজ্জার। হাত থেকে তার আগে হাতিয়ার ফেলে দেওয়াই উচিত।

দেবকীনন্দন অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল।

এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না?

হ্যাঁ,—করবে সে, অন্তত চেষ্টা করবে। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার করবে সে বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে। পাপ? এতে কোন পাপ আছে বলে সে মনে করে না।

দেবকীনন্দনের পরণে তখনও সিপাহীর বেশ। সুতরাং হুইলারের অবরোধে ঢোকবার কোন অসুবিধাই হ'ল না। লক্ষ্য ক'রে দেখলে যে জন-তুই এদেশী লোক, খুব সম্ভব কোন সাহেবের প্রাক্তন খানসামা হবে—আমিনুদ্দীদের খোসামোদ করছে ভেতরে যাবার জন্য। ওকে কেউ কোন প্রশ্নই করলে না। আজ সন্ধির সুযোগ পেয়ে বহু সিপাহীই ভেতরে এসেছে, খোঁজ খবর নিচ্ছে—পুরোণো মনিবদের। স্বয়ং আজিমুল্লা এখানে রয়েছেন—নানার বিশ্বস্ততার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ!

তখন ভোরের বেশী দেরী নেই। মুক্তির প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে সকলে। গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে!

একজন অপরিচিত সাহেবকে সামনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছেই খোঁজ চাইলে দেবকীনন্দন। কর্ণেল উইলিয়ামস্? কে জানে তিনি কোথায়—তাঁর মেমসাহেব ঐ যে, ঐ সামনের ঘরটাতে আছেন!

ঘরে ঢুকতে গিয়েও খানিক ইতস্ততঃ করলে দেবকীনন্দন। তারপর মনে জোর এনে একরকম মরীয়া হয়েই ঢুকে পড়ল।

'মেমসাহেব চিনতে পারেন ?'

'কে—দেওকীনন্দন না ? এসো এসো।'

মিসেস্ উইলিয়াম্স্ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'কেমন আছ দেওকীনন্দন ?'

এঁর কাছে বিশেষ ক'রে আসার কারণ আছে বৈ কি !

দেবকীনন্দন তখন এঁদের দলেই অর্থাৎ ৫৬নং রেজিমেণ্টে ছিল। একদিন দেশ থেকে খবর এল যে ওর মেয়ে ভীষণভাবে পুড়ে গেছে—বাঁচার কোন আশাই নেই। গাঁয়ে ছিল একজন বৈদ্য—তাঁর হাতুড়ে চিকিৎসায় আরও খারাপ হয়েছে। বড় মেয়ে, আদরের প্রথম সন্তান। দেবকীনন্দন রোকা পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ব্যারাকের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দূর থেকে দেখতে পেয়ে এই উইলিয়াম্স্ সাহেবই তাকে ডেকে পাঠান।

'কী হয়েছে বলো ত দেওকীনন্দন ? চোখ ছল ছল করছে তোমার, পাগলের মত হাবভাব ? ব্যাপার কি ?'

উত্তরে দেবকীনন্দন কেঁদে ফেলেছিল।

ওর মুখ থেকে সব শুনে উইলিয়াম্স্ ব্যারাকের সাহেব ডাক্তারকে খুঁজে বার করেন। তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে অনুরোধ করেন দেবকীনন্দনের গ্রামে যেতে একবার। উইলিয়াম্স্-এর অনুরোধ এড়াতে না পেরে সে সাহেব ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে কাঠফাটা রোদের মধ্যে ষোল ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে দেবকীনন্দনের গাঁয়ে গিয়েছিলেন। তাই সে যাত্রা ওর মেয়ে বেঁচেছিল—নইলে বাঁচবার কোন আশাই ছিল না।

সে কৃতজ্ঞতা দেবকীনন্দন আজও ভোলেনি।

কিন্তু এখন আর কুশল প্রশ্নের সময় নেই। সে মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌-এর কথার জবাব না দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বললে, 'মেমসাহেব, দোহাই আপনার, হুইলার সাহেবকে বুঝিয়ে বলুন যেন উনি নানা সাহেবের ফাঁদে পা না দেন। নানা সাহেবের মতলব ভাল নয়—ঝোপ-ঝাড়ে উনি কামান সাজাচ্ছেন, কাল আপনারা যে মুহূর্তে নৌকোয় পা দেবেন সেই মুহূর্তে শুরু হবে গোলা আর গুলি। এ কাজ করবেন না মেমসাহেব।'

মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ স্থির ভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'এখন আর কোন উপায় নেই দেওকীনন্দন। আমাদের নতুন কামানগুলো, টাকাকড়ি সব নানা সাহেবের লোকের হাতে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তা ছাড়া আমরা এমনিও আর পারছিলাম না। এভাবে আর কিছুদিন চললে হয়ত আমাদের আত্মহত্যাই করতে হ'ত। কিন্তু তুমি যে আমাদের সত্যিকার উপকারই করতে এসেছিলে তা আমরা ভুলব না কখনও—তুমি যা বলছ তাই যদি সত্যি হয় ত মৃত্যুর সময় এই আশ্বাস নিয়েই চোখ বুজব যে পৃথিবীতে সবাই বিশ্বাসঘাতক নয়—এখনও এখানে মানুষ আছে।'

দেবকীনন্দন ঘাড় হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবারও মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌কে একটা সেলাম জানালে। সে হয়ত তারপর তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে আসত যদি না মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ ওকে একটু দাঁড়াতে বলতেন।

'একটু দাঁড়াও দেওকী—এক মিনিট।'

দেবকীনন্দন ঘুরে দাঁড়াল, ওর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েও রইল কিন্তু কোন প্রশ্ন করলে না।

মিসেস উইলিয়াম্‌সও ওকে আর কোন কথা না ব'লে ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা কাগজে খস্‌খস্‌ ক'রে ছু'লাইন কি লিখলেন—তারপর কাগজটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'দেওকীনন্দন, আমরা মরব এটা হয়ত ঠিকই—কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে তোমার নানা-সাহেব অব্যাহতি পাবে না। এ বিশ্বাসঘাতকতার দাম তাকে বা তার দলের লোককে শোধ করতেই হবে। সে দিনটা তোমাদের বড় ছুর্দিন। তেমন দিন যদি আসে এবং তুমি কখনও কোন ইংরেজের হাতে বিপদে পড়ো ত—এই কাগজখানা দেখিও, অবশ্য ছাড়া পাবে। ভাল ক'রে রেখে দাও এখানা। বেঁচে থাকলে তোমার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে আশা ত প্রায় নেই-ই!'

ম্লান একটু হাসলেন মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্।

দেবকীনন্দন ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

ছু'একজন পরিচিত সিপাহীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা ছু'একটি রসিকতা করারও চেষ্টা করলে দেবকীনন্দনের তরফ থেকে কোন জবাব এল না। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক, কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তেমনি আপন মনে ভাবতে ভাবতেই হুইলার সাহেবের গড় থেকে বেরিয়ে এল সে। গড়ই বটে। মনে আছে এটা যখন তৈরী হয় আজিমুল্লা ঠাট্টা ক'রে বলেছিল—'এটার কী নাম দিচ্ছ সাহেব—ন-

উমীদ গড়, না নাচার গড় ?' যে সাহেবকে বলা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন,—'না—বিজয়গড়। ফতেগড়ও বলতে পারো।' হায় রে! গড়ের দেওয়াল পার হবার সময়, কথাটা মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও দেবকীনন্দনের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল আজিমুল্লার কথাটাই ঠিক হ'ল তাহ'লে।

হুইলার সাহেবের নাচার গড় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েও দেবকীনন্দন নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পথে অত্যধিক ভীড়। কৌতূহলী জনতা—সাহেব মেমদের পরিণতি দেখবার জন্য উৎসুক। তাদের কানে হয়ত তখনও আসল খবর পৌঁছয়নি, তারা শুধু জানে যে সাহেবরা এইবার পালাচ্ছে। তবু যারা এত দীর্ঘকাল এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে—তারা না জানি কী ধরণের মানুষ। তাদের একবার কাছাকাছি থেকে দেখা দরকার।

এদের সাহচর্য, ভেসে-আসা এদের কথাবার্তার টুকরো—কিছুই ভাল লাগল না দেবকীর। শেষে কোনমতে ভীড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা পথে এসে পড়ল। তারপর সেই পথ ধরেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল গঙ্গার ধারে। এখানটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। এদিক দিয়ে বিশেষ লোকজন আনাগোনা করে না—দেবকীনন্দন শান্তিতে একটা নিমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে মাটির ওপরই বসে পড়ল।

অন্ধকার তামসী রাত্রি। এপার ওপার কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি গঙ্গাও বোঝা যেত না—যদি না চলন্তি দু'একটা নৌকোর আলো দেখা যেত। সেই আলো নৌকোর গতিবেগে আন্দোলিত

ঈষৎ তরঙ্গিত গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব জাগিয়েছে—তাইতে বোঝা যাচ্ছে শুধু যে সবটাই অন্ধকার সীমাহীন শূন্যতা নয়—দেবকীনন্দন যেখানে বসে আছে তার নিচে দিয়ে বয়ে চলেছেন পুণ্যসলিলা, সকল কলুষনিবারণী, শান্তিদায়িণী জাহ্নবী ·····

এ জীবন শেষ করার এ অপূর্ব সুযোগ।

লোভ? লোভ হয় বৈ কি!

দেবকীনন্দনেরও লোভ জাগল বহুবার। কিন্তু সে লোভ সে শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করলে। এতে হয়ত নিজের মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সে ত কেবল নিজেই পালাতে চায় না—সে চায় তার সহকর্মীদের হয়ে, তার জাতির হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে। এখন এভাবে মরলে তার চলবে না।

দেবকীনন্দন সেইখানেই স্থিরভাবে বসে রইল।

ক্রমে ভোর হ'ল। দূরে সতীচোরা ঘাটের কর্মব্যস্ততা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সারারাতই সেখানে কাজ হয়েছে, তার আভাস পেয়েছে দেবকীনন্দন। এখন আরও বেশী। কতকগুলো নৌকোতে ছই ছিল না ·· ঘাস পাতা দিয়ে ছই ক'রে দেওয়া হচ্ছে, পাছে মেমসাহেবদের রোদে কষ্ট হয়। তোলা হচ্ছে জলের কলসী ও ও আটার বস্তা, চিনি, মাখন আরও কত কি!

অর্থাৎ ছলনার আয়োজনে যেন কোথাও কোন খুঁৎ না থাকে। কলে পড়বার আগের মুহূর্তেও মূষিক না বুঝতে পারে যে ওটা জাঁতিকল—এখনই তার পা চিরকালের মত লৌহ-কঠিন নির্মম দাঁতে আটকে ·াড়বে।

বাহবা আজিমুল্লা খাঁ।

এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের দিকে আজিমুল্লা ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে নজর রাখে!

দেবকীনন্দনের মুখে একটা বিচিত্র ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

এই বুদ্ধি যদি তুমি কাজের মত কাজে খরচ করতে! তাহ'লে তোমার সত্যিকার উন্নতি হ'ত!··

একটু একটু ক'রে বেলা বাড়তে লাগল।

সতীচৌরা ঘাটে ভীড় জমছে ক্রমশঃ।

সাহেব মেমরা এসে পৌঁছতে লাগলেন।

কেউ বা ডুলিতে, কেউ বা পাল্‌কীতে, কেউ কেউ বয়েল গাড়িতে!

সুস্থ সবল খুব কম লোকই আছে, যারা আছে তারা হেঁটে আসছে।

অতদূর থেকে মুখভাব ঠাওর হয় না—তবে ওদের কর্মব্যস্ততা দেখে বুঝতে পারে দেবকীনন্দন যে ওদের বেশীর ভাগ লোকই নিশ্চিন্ত, মুক্তির আনন্দে মশগুল। যেন কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা সত্যিই পাবে মুক্তি, পাবে নিরাপদ জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধা।······

তারপর—

তারপর শুরু হ'ল আসল নাটকটা।

দেবকীনন্দন শিউরে উঠে চোখ বুজলে, দু'হাতে ঢাকলে কান। তবু তার মধ্যে দিয়েই মুহুর্মুহুঃ গুলির শব্দ এবং অসহায় নরনারীর আর্তনাদ কানে আসতে লাগল। তার সঙ্গে কিছু কিছু পৈশাচিক উল্লাসের বিকট হুহুঙ্কার।

চোখের পাতা বোজা আছে। কিন্তু জ্বলন্ত নৌকোর তাপ

মুখে এসে লাগতে বাধা কি ? তাতেই ত বোঝা যায় কী হচ্ছে সেখানে।

হে গুরু। হে দয়াল। হে শিবশঙ্কর !

এ পাপের না জানি কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে—দেশকে ও জাতিকে !

সারা দিনই একভাবে বসে রইল দেবকীনন্দন, তারপর সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়ে নামল গঙ্গায়।

ততক্ষণে কোলাহল ও আর্তনাদ দুইই স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আবার গঙ্গার বুকে নেমে আসছে অন্ধকার—শান্তির ছায়া।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল দেবকীনন্দন।

জলে দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করবার চেষ্টা করল—কিন্তু সে ছবি মনে জাগল না। গায়ত্রী পড়তে গেল, তাও যেন ভুলে গেছে আজ।

শুধু চোখের জলে সব ক্রুটি ধুয়ে গেল ওর।

মাথায় ঠাণ্ডা জল পড়তে, চোখের শুষ্কতাও কেটেছে।

দুই চোখের কোল বেয়ে উষ্ণ জল গড়িয়ে পড়ছে শীতল আর্দ্র কপোলে।

মা গঙ্গা—এ কী করলি মা !

তোর জলেই এই এতবড় অনাচার ঘটল ?……

অনেক, অনেকক্ষণ পরে দেবকীনন্দন উঠে এল। তারপর এগিয়ে চলল—ব্যারাকের দিকে নয়, এলাহাবাদ যাবার পাকা সড়কটার দিকে—

কাশী ও এলাহাবাদ কঠোর, নিষ্ঠুর হাতে শাসন ক'রে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য আসছে কানপুরের দিকে। চোখে তাদের জিঘাংসা, ওষ্ঠের কঠিন ভঙ্গীতে প্রতিহিংসা। কানপুরের কাহিনী ইতিমধ্যেই কানে পৌঁচেছে বৈ কি!

তাদের পথের ছ'ধারে বহুদূর অবধি লোকালয় শূন্য করে ভারত-বাসীরা পালিয়ে গেছে। ইংরেজের সামনে সেদিন কেউ পড়লে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল।

এমন সময় ও কি?

একজন সিপাহী আসছে না?

শিকারের দিকে ধাবমান ক্ষুধিত নেকড়ের মতই ছুটে এগিয়ে এল জ'না-আষ্টেক ইংরেজ।

'তুমি সিপাহী?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নানা সাহেবের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কানপুরের খবর কি? সত্যি বলো, নইলে—'

'নইলে কি তা আমি জানি সাহেব। কিন্তু সত্যিই বলছি। বোধ হয় একজনও বেঁচে নেই সাহেব-মেমেরা। আমরাই বিশ্বাসঘাতকা ক'রে মেরেছি।'

আর শোনবার সময় হ'ল না।

এমন কি পৈশাচিক কোন দণ্ড দেবার জন্য অপেক্ষা করার

মত ধৈর্যও রইল না। নিমেষে ঝল্‌সে উঠল একজনের তরবারি।

একটি শব্দ না ক'রে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল সিপাহীর দেহ। লালরক্তে ডেলা পাকিয়ে গেল খানিকটা ধুলো।

ততক্ষণে জেনারেল সাহেব নিজেও এসে পৌঁচেছে।

'একি করলে তোমরা ?'

'এ যে সিপাহী।'

'কিন্তু সিপাহী যদি ত লোকটা পালাবার চেষ্টা না ক'রে তোমাদের হাতে এসে ধরা দিলে কেন ?'

তাও ত বটে। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

কে একজন বললে, 'ও নিজে স্বীকার করেছে ওর অপরাধ। কানপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাও স্বীকার করেছে।'

কঠিন হয়ে উঠল জেনারেলের কণ্ঠস্বর, 'মূর্খের দল! তখনই বোঝা উচিত ছিল যে এ লোকটি সাধারণ সিপাই থেকে কিছু ভিন্ন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এত সহজে কেউ স্বীকার করে ? দ্যাখো ত ওর কাগজপত্র !'

পকেটে ছিল মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্-এর চিঠি। জলে বা ঘামে ভিজে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তবু তার মর্ম কিছুটা উদ্ধার করা গেল বৈ কি !

জেনারেল সাহেব নিরবে টুপি খুললেন।

মুখুজ্জে মশাই

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগেকার কথা—১৮৫৭ সাল। সারা ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে।

এর একশ' বছর আগে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রথম নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর থেকে এই একশ' বছরেই তাদের স্বরূপ কতকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল! যারা বুদ্ধিমান তারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজ শুধু রাজত্বটাই গ্রাস করতে চায় না, এর যা কিছু সম্পদ তা কেড়ে নিয়ে গিয়ে এ-দেশকে মহা-শ্মশানে পরিণত করতে চায়। তাই হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করেছিল ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে। পারতও তারা—যদি না বাঙ্গালীরা মাদ্রজীরা এবং কতকগুলি রাজা ও সর্দার ইংরেজদের সাহায্য করত। এই বিদ্রোহকেই ইংরেজরা নাম দিয়েছিল 'সিপাহী-বিদ্রোহ।'

কিন্তু সে ইতিহাসের কথা। আমি আজ সেই সময়কার একটা গল্প বলতে বসেছি।

আমার মায়ের মামার মামা সেই সময় কমিসেরিয়াটে কাজ করতেন মীরাটে। তাঁরই একটি পুরাতন বিবর্ণ চিঠি সেদিন দিদিমার বাক্স খুঁজে উদ্ধার করেছিলাম। সেই চিঠি থেকেই গল্পটা পেয়েছি।

বিদ্রোহের সূচনা থেকেই ওখানকার বাঙ্গালীরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন! তাঁরা গোপনে ইংরেজদের সাহায্য করতেন কিন্তু বাইরে দেখাতে হ'ত তাঁরা নিরপেক্ষ; নইলে বিদ্রোহীদের হাতে রক্ষা ছিল না। তবে একটা সুবিধে করে নিয়েছিলেন তাঁরা যাঁরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন ইতিমধ্যে। পাশাপাশি দুটো বাড়িতে মেসের মত সবাই এক সঙ্গে বাস করতেন। সুবিধার মধ্যে মেয়েছেলে সঙ্গে ছিল না কারুর—তবু দিন-রাত সর্বদা একটা আতঙ্ক ছিল। ভয় দু-দলকেই, দু-দলই বাঙ্গালীকে সন্দেহের চোখে দেখে।

যে কথা বলছিলুম—আমার মায়ের মামার মামা, তাঁর নাম ছিল প্রতাপ রায়—তিনিও সেই মেসে থাকতেন। তাঁদের মেসে সব চেয়ে প্রবীণ লোক ছিলেন মুখুজ্জে মশাই। তিনি বড় চাকরী করতেন, বুদ্ধিসুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ ছিল, তার ওপর বয়সে বড়—সেইজন্য সবাই তাঁকে মান্য করত খুব। তিনিই যেন ছিলেন এদের দলপতি-গোছের।

একদিন প্রতাপ রায় সকালবেলা উঠে আহারাদির যোগাড় করছেন, কে একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে হুড়মুড় করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সবাই চমকে উঠে দেখলে, একটি তরুণ ইংরেজ লেফ্‌টেন্যাণ্ট। দু-তিনজন তাকে চিনত—রবার্ট এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ নাম, সবে এসেছে বিলেত থেকে, ক্যাম্পবেলের দলে কাজ করে।

'কী ব্যাপার?' সবাই প্রশ্ন করলেন।

রবার্টের পোশাক ছেঁড়া, পা কেটে রক্ত পড়ছে, এক পায় জুতো

সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, মুখ ভয়ে সাদা। সে যা বললে তার অর্থ এই যে, সিপাহীদের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে কোন মতে—তিন ঘণ্টা ধরে ছুটছে সে, আর তার চলবার মতও ক্ষমতা নেই। সে একটু আশ্রয় চায়।

'সিপাইরা কি জানে যে তুমি এদিকে এসেছ ?' মুখুজ্জে মশাই প্রশ্ন করলেন।

একটুখানি থেমে রবার্ট উত্তর দিল, 'তা বোধহয় জানে !' তখন-কার ইংরেজরা খুব তাড়াতাড়ি মিছে কথা বলতে পারত না।

তবে ? ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে উঠল। উপেনবাবু বললেন, 'না সাহেব, তা আমরা পারব না। তোমার একজনের জন্যে আমরা সব ক'জন মরব ?'

জগন্নাথ ঘোষাল বললেন, 'বরং এক কাজ করো, পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে যাও, খানিকটা গেলেই আম-বাগান পাবে, সেইখানে লুকিয়ে থাকো।'

রবার্টের মুখ আরও সাদা হয়ে গেল। বেচারীকে দেখলে তখন দুঃখ হয়। সে বললে, 'কিন্তু বাবু বিশ্বাস করো, আমি আর এক পা-ও চলতে পারছি না !'

'তা আমরা কি করব ! বা-রে !' সবাই রেগে উঠল।

হঠাৎ এগিয়ে এলেন মুখুজ্জে মশাই। বললেন, 'উপেন, আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণ ; আশ্রিত আতুরকে বিমুখ করব প্রাণের ভয়ে ? সেটা কি উচিত হবে ?'

'কিন্তু বিপদটা কতদূর তা ভেবে দেখেছেন ?'

'আমরা ত' কোন পাপ করছি না, বিপদ হবে কেন ? আমি

বলছি জগন্নাথ কোন ভয় নেই। ঈশ্বর আছেন মাথার ওপর, বিপন্নকে আশ্রয় দেবার জন্য বিপদ হবে না কখনই।....এসো সাহেব আমার সঙ্গে—

তিনি সাহেবকে ঘরে এনে বসালেন, একটুখানি সরবৎ খাইয়ে সুস্থও করলেন। কিন্তু খানিকক্ষণ কাটতে না কাটতেই দূরে কোলাহল শোনা গেল। এ শব্দ সবাইকার পরিচিত, সিপাহীরা আসছে।

কী হবে? সবাইকার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। মুখুজ্জে মশাই কিন্তু এতটুকু ভয় পেলেন না—তিনি তখনই সাহেবকে তার পোশাক ছাড়িয়ে নিজের আহ্নিক করবার গরদ পরিয়ে দিলেন, তারপর নিজেরই গলা থেকে পৈতাটা নিয়ে ওকে পরিয়ে কুশাসনের ওপর সামনে কোশাকুশি দিয়ে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপেনকেও সন্ধ্যা করতে বসিয়ে রবার্টকে বলে দিলেন, 'খুব সাবধান, উপেনবাবু যেমন যেমন করবে, তুমিও ঠিক তেমনি করবে। ঐ দিকে চেয়ে আছ তারা না বুঝতে পারে অথচ ওকে দেখেই তুমি কোশাকুশি নাড়বে, আর আমরা না বললে কথা কইবে না।'

এই সব ব্যবস্থা শেষ করতে না করতেই হৈ-হৈ করে সিপাহীরা এসে পড়ল। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন উঠানে ঢুকে পড়ে প্রশ্ন করলে, 'এদিকে একজন ছোক্‌রা সাহেব এসেছিল, কোথা গেল?'

'জানিনে ত?' প্রশান্ত মুখে বললেন মুখুজ্জে মশাই।

'কিন্তু সে এই দিকেই এসেছে—আমরা ঠিক দেখেছি।'

'তা'হলে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই তোমাদের ভুল হয়েছে।'

ওরা এমন জবাব পেয়ে একটু দমে গেল। কিন্তু একজন বললে, 'আমরা বাড়ীটা দেখ্‌ব। তোমরা লুকিয়ে রেখেছ কিনা!'

'স্বচ্ছন্দে দেখোগে।'

এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে পূজোর ঘরে এসেই ওরা লাফিয়ে উঠল, 'এই যে!'

প্রতাপদের ত প্রাণ-পাখী খাঁচা-ছাড়া হবার জোগাড়! কিন্তু মুখুজ্জে মশাই একটুও ভয় পেলেন না। বললেন, 'বিলক্ষণ, ও যে আমার ভাগ্নে! কোনদিন আমাকেই বলবে সাহেব!'

'তোমার ভাগ্নের অমন সাদা রং?'

'জন্মাবধিই এই রকম। সাদা মানুষ হয় এক-একজন দেখোনি? দেখছ গলায় পৈতে, সন্ধ্যা-আহ্নিক করছে!'

'তা বটে!' ওরা চেয়ে চেয়ে দেখলে, নিখুঁত ভাবে সে কোশাকুশি নাড়ছে, আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে মনে মনে।

তবু সন্দেহ যায় না। কিন্তু এ-কথাটা কারুর মনে হ'লো না যে বাঙ্গালী ত বাংলায় কথা বলুক—একজন শুধু বললে, 'বেশ, তোমার ভাগ্নে যদি হয় ত ওকে নিয়ে তোমরা খেতে বসো!'

এটা অবশ্য আজকাল এমন কিছু বড় কথা না হ'লেও, তখনকার দিনে ভয়ঙ্কর কথা ছিল। ম্লেচ্ছ, বিধর্মী, খ্রীষ্টানের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। তার চেয়ে বরং না খেয়ে মরে যাওয়াও ঢের সহজ ছিল!

কিন্তু মুখুজ্জে মশাই একটুও দমলেন না। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বললেন, 'বেশ ত দেখোনা, ভাতও প্রস্তুত—এখনই খেতে বসব।'

বাকী সকলের দিকে চেয়ে চুপি চুপি বললেন, 'আতুরে নিয়মো নাস্তি! পরের প্রাণ-রক্ষার্থ কোন-কিছুই অন্যায় নয়!'

সকলেই যে এত সহজে কথাটা মেনে নিলেন তা নয়—কিন্তু কীই

বা করবেন। এদিকেও শিয়রে শমন। মনে মনে মুখুজ্জের মুণ্ডপাত করতে করতে বাইরের হাসিমুখ বজায় রাখলেন।

যথাসময়ে ঠাঁই করা হলো। এক পংক্তিতে রবার্টকে নিয়ে ব্রাহ্মণের দল খেতে বসলেন। সিপাহীরা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল।

রবার্টের চোখ কৃতজ্ঞতায় ছল্-ছল্ করতে লাগল। যাবার সময় মুখুজ্জে মশাইয়ের হাত-তুটি ধরে অনেক ধন্যবাদ জানালে। সন্ধ্যা হ'তেই আম-বাগানের ছায়া ধরে সে যাত্রা করলে দিল্লীর দিকে।

শুধু যাবার সময় একটি সাংঘাতিক সংবাদ দিয়ে গেল সে। দিল্লী যখন শাজাহান বাদশা আগাগোড়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরেন তখন এক জায়গায় এসে তাঁর পাঁচিলের সরল রেখা বাধা পায়। এক ফকীরের আস্তানা ছিল সেখানে, সে আস্তানা না সরালে পাঁচিল গাঁথা ঠিক মত শেষ হয় না।

ফকীরের খুব নাম-ডাক, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে ভক্তি করে—যথার্থ সাধুপুরুষ একজন। সুতরাং চট্ করে তাঁকে উঠিয়ে দিতে সাহস হলো না। বাদশা নিজে এলেন তাঁর কাছে, প্রস্তাব করলেন দিল্লী শহরের ভেতরে বা বাইরে যেখানে যত জমি দরকার তিনি দিতে রাজী আছেন—ফকীর সাহেব দয়া করে এই স্থানটুকু ছেড়ে দিন!

ফকীর প্রশ্ন করলেন, 'বেটা, তুমি পাঁচিল তুলছ কেন?'

'শহর যাতে নিরাপদ থাকে এই জন্য। ভবিষ্যতে যদি কখনও শত্রুরা দিল্লী আক্রমণ করে—'

'তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও বৎস, এখানটা খোলাই থাক, কোন শত্রু এ রন্ধ্রপথে অন্ততঃ দিল্লীতে ঢুকবে না!'

বাদশা ফকীরকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, তিনি আর আপত্তি না ক'রে ফিরে গেলেন।

সেই গল্পটি সাহেবরা শুনেছিল। দিল্লী অবরোধ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তারা খুঁজছিল সেই ভাঙ্গা জায়গাটি, যেখান দিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। আশ্চর্যের কথা—কেউ দেখাতে পারেনি সে পথটা!

রবার্ট নাকি কোন্ এক পাঞ্জাবীর কাছ থেকে খবরটা আদায় করেছে। তার প্রপিতামহ ছিল সেই সময় রাজমিস্ত্রী, তার কাছে সেই প্রাচীন আমলের নক্সাটাও ছিল। সেইটে আদায় ক'রে রবার্ট ছুটেছে ইংরেজ সেনাপতিকে পৌঁছে দিতে।

রবার্ট চলে যাওয়ার পর মুখুজ্জে মশাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর বললেন 'আমার ঘোড়াটা ঠিক করো—আমি বেরোব।'

'কোথায় যাবেন এই রাত্রে?' সবাই অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করল।

'ঐ রবার্টকে আমায় ধরতেই হবে।—নক্সাটা ইংরেজদের হাতে পড়তে দেব না কিছুতেই। দিল্লী যদি এমনি ওরা দখল করতে পারে ত করুক কিন্তু রবার্টের ঐ নক্সাটার জন্য যদি ওরা হঠাৎ দিল্লী দখল করে আর বিদ্রোহীরা হেরে যায়, তাহ'লে দেশদ্রোহিতার পাপ অর্শাবে আমাদের। একে ত ওরা দেশেরই স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে

যুদ্ধ করছে অথচ আমরা ওদের সাহায্য করতে পারছি না, তার ওপর এই ভাবে সর্ব্বনাশের কারণ হবো না।'

মেসের সবাই তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করল প্রাণপণে। এই দীর্ঘ এবং বিপদসঙ্কুল পথ, রাত্রিবেলা,—কোথায় যাবেন বুড়োমানুষ? অদৃষ্টে যা আছে তা ত হবেই!

কিন্তু মুখুজ্জে মশাই কোন কথাই শুনলেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক সারা হলো না, মুখে একটু জল পর্যন্ত দিলেন না—তখনই ঘোড়ায় চেপে রওনা হলেন।

অন্ধকার রাত্রি। পথ দেখা কঠিন। তার ওপর দিল্লী যাবার যেটা সরকারী রাস্তা, সেটা দিয়ে গেলে সিপাহীদের হাতেই পড়ুন আর ইংরেজদের হাতেই পড়ুন, মৃত্যু অনিবার্য। এই অন্ধকার রাত্রিতে বাইরে বেরোবার কী কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি? তবে একটা সুবিধা, রবার্টও বড় রাস্তা দিয়ে যেতে সাহস করবে না। বনের মধ্য দিয়ে যে পথটা বেরিয়ে ঘুরে গেছে, সেই পথেই সে গেছে নিশ্চয়। মুখুজ্জে মশাইও সেই পথ ধরলেন।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই মহা বিপদে পড়লেন। বন থেকে বেরিয়ে একটা রাস্তায় সবে পড়েছেন, হঠাৎ দেখেন দু-দিক থেকে দু-টি দল! কে কোন্ পক্ষ তখন কিছুই বোঝার কথা নয়—তবে যেভাবে মশাল জ্বালিয়ে আসছে হৈ-হৈ করতে করতে, সিপাহীর দল নিশ্চয়ই, ওদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নাই।

এদিক-ওদিক চেয়ে মুখুজ্জে মশাই দেখতে পেলেন একটা বড়

নর্দমা চলে গেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। তার ওপর একটা বাঁকানো সাঁকো। আর একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে মুখুজ্জে মশাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে কোন-মতে ঢুকলেন সেই নালার মধ্যে। ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই হৈ-হৈ করে দু'দল এসে মিলল ঠিক সেইখানেই। একদল ছিল পাঞ্জাবী সিপাই, তারা ইংরেজদের দিকে, আর একদল হিন্দুস্থানী। বিষম যুদ্ধ হলো—কত লোক যে মারা গেল, কত যে আহত হলো, তার ঠিক নেই। দুটো কাটা মুণ্ডু ছিট্‌কে নালির ভেতর মুখুজ্জে মশাইয়ের কাছে গড়িয়ে এল। মুখুজ্জে মশাই তখন প্রাণপণে স্থির হয়ে বসে এক মনে গায়ত্রী জপছেন, আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে। যা করেন ভগবান, যা হয় হবে!

অনেকক্ষণ পরে একদল হেরে পালাল, আর একদল তাদের পিছু-পিছু ছুটল, জায়গাটা কিছু ফাঁকা হলো। তখন আশ্বস্ত হয়ে মুখুজ্জে মশাই বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আবার যাত্রা শুরু করার আগে একটি কাজ করলেন তিনি, দুজন মৃত সিপাহীর কোমর থেকে দুখানি তলোয়ার সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সেই রাস্তা ধরেই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলেন।

এতটা দেরি হয়ে গেল এখানে, ইতিমধ্যে রবার্ট কতদূর এগিয়ে গেছে কে জানে! দিল্লী পৌঁছবার আগে ধরতেই হবে তাকে।

অবশ্য একটু পরেই তিনি রবার্টের দেখা পেলেন। সে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল, তারপর ভোরের আলোয় মুখুজ্জে মশাইকে চিনতে পেরে উজ্জ্বল-মুখে এগিয়ে এল।

মুখুজ্জে মশাই তার দিকে একখানা তলোয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও—নিজেকে বাঁচাও। ঐ নক্সাখানা আমার চাই। এমনি না দাও, তোমাকে মেরে নেব।'

'সে কি?' বিস্ময়ে রবার্টের মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না। এই কি সেই মানুষ—যে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তাঁকে বাঁচিয়েছে?

'সিপাহীরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে—তুমি যাচ্ছ তাদের সর্ব্বনাশ করতে। কাল যদি তাদের মিথ্যা ব'লে প্রতারিত না করতাম, তাহলে তোমাকে তারাই মেরে ফেলত, ও-নক্সা ইংরেজ সেনাপতির হাতে পড়বার সম্ভাবনা আর থাকৃত না। সুতরাং এ দায়িত্ব এখন আমার। আমাকেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

রবার্ট অবাক হয়ে বললে, 'আমাকে যদি মারবেই, তাহলে বাঁচালে কেন তখন?'

'ও তুমি বুঝবে না সাহেব! আমরা হিন্দু, আশ্রিতকে বাঁচানো আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন ত আর তুমি আশ্রিত নও আমার।…যাক্—যদি নক্সাটা এম্‌নি দিয়ে দাও ত তোমায় মারব না।

রবার্ট ঘাড় নেড়ে বললে, 'তা হয় না। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, প্রয়োজন হ'লে তোমাকে আমি প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু এ নক্সা দেবার অধিকার আমার নেই। এ আমার জাতির প্রাপ্য, আমার দেশের মঙ্গল নির্ভর করছে এর ওপর। পারো তুমি আমাকে মেরে নাও—তার জন্য একটুও দুঃখ থাকবে না আমার।'

রবার্ট যদিও ছেলেমানুষ আর মুখুজ্জে মশাই বৃদ্ধ, তবু তখন বাঙ্গালী লাঠি খেলত, তলোয়ার খেলৃত, কুস্তী লড়ত। গায়ে জোর

ছিল খুব। শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জে মশাই-ই জিতলেন। রবার্ট আহত হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে গেল। ওর জামার পকেট থেকে নক্সাটা বার করে নিয়ে মুখুজ্জে মশাই টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন, তারপর তলোয়ারখানা সেখানেই ফেলে দিয়ে আবার বাসার পথ ধরলেন।

ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিন দিন তিন রাত না-খেয়ে জপ করলেন মুখুজ্জে মশাই।

মেসের লোকে আড়ালে বলাবলি করলে, 'পাগল!'

চিরন্তন

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলতে বসেছি। আপনারা যাঁরা এ গল্প শুনতে চান, বর্তমান পরিবেশ থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান ইতিহাসের পাতার মধ্যে। সেই একশ বছর আগেকার ভারতকে কল্পনা করার চেষ্টা করুন।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সারা ভারতে। সে আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ব্যারাকপুরে দেখা গেলেও বাংলা মোটামুটি শান্তই ছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হ'ল মীরাট থেকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদী সিপাহীদের মুক্ত ক'রে ইংরেজদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ক'রে এগিয়ে এল দিল্লীর দিকে। তারপর সেখানে লালকেল্লা দখল ক'রে বৃদ্ধ এবং প্রায়-অন্ধ বাহাদুর শাকে তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা বলে ঘোষণা করতে দেরি হ'ল না। কারণ ইংরেজ কোম্পানীর জোর দিল্লী দুর্গে ছিল না, ছিল মীরাটেই। জেনারেল হিউয়েট দুহাজার শ্বেতাঙ্গ ফৌজ নিয়ে মীরাটে বসেছিলেন, তিনিই যখন কিছু করতে পারলেন না, দিল্লীর মুষ্টিমেয় ইংরেজ কি করবে? এই দিল্লী দখল করারই যেন অপেক্ষা করছিল ভারতের বাকী সিপাহীরা। এক সঙ্গে সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠল—কানপুর, আগ্রা, বেরিলি, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ এমন কি রাজপুতানারও কোন কোন স্থানে। যদিচ সেখানে বেশি কিছু হয়নি, কারণ দেশীয় রাজারা সেদিন ইংরাজদেরই সমর্থন করেছিলেন।

তাঁরা যে বহু দিন পরে ইংরেজদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্বাদ পেয়েছেন।

আরায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জগদীশপুরের কুঁয়ার সিংহ—বিদ্রোহের প্রধান চক্রী। কিন্তু তিনি অতি সহজেই পাটনা ডিভিসনের কমিশনর টেলারের কাছে হেরে গেলেন! কাশীর বিদ্রোহ দমন করলেন কর্ণেল নীল। এলাহাবাদ দুর্গ তখনও ক্যাপ্টেন ব্রেজার মুষ্টিমেয় শিখ সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছেন—বিদ্রোহীদের হাতে পড়তে দেননি। নীল কাশী দখল করেই আগে এগিয়ে গেলেন এলাহাবাদে, কারণ ব্রেজারকে উদ্ধার না ক'রে অন্য কোন কাজে মন দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারপর আর তিনি ইংরেজ বা শিখ সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না—তারা অন্য সমস্ত কর্তব্য ভুলে প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠল। নীল গবর্ণর জেনারেলের নামে কাশী ও এলাহাবাদ অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করলেন, আর সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আশ মিটিয়ে সদ্য প্রতিহিংসার লাল সুরা পান করতে লাগল। বিদ্রোহী, সাহায্যকারী, সন্দেহভাজনরা ত বটেই—এমন কি বলিষ্ঠ তরুণ ছেলেরা শুধু মাত্র তরুণ ও বলিষ্ঠ এই অপরাধেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হ'ল! হত্যার কত রকম উপায় যে নিত্য উদ্ভাবিত হ'তে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। অসামরিক ইংরেজরা পর্যন্ত ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের সঙ্গে মিলে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঘাতকের কাজ করতে লাগল। রক্ত-পানের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল চারিদিকে।

কানপুরে কিন্তু অত সহজে মেটেনি। এই বিদ্রোহের মূল নায়করাই সেখানে ছিলেন—নানা সাহেব ও তাত্যা টোপী।

ওখানকার ইংরেজরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না, সামরিক ও অসামরিক মিলিয়ে শ-চারেক পুরুষ, এবং শ-দুই স্ত্রীলোক ও শিশু। এঁরা সকলেই কোন-মতে একটা ঘাঁটি-মত ক'রে তাতে আশ্রয় নিলেন ও প্রাণপণে সিপাহীদের অবরোধ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু একে ত এই ক'টি লোক, তার ওপর ওঁদের সেনাপতি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ হুইলার। সুতরাং প্রাণপণেরও একটা সীমা আছে। অবশেষে আত্মসমর্পণ করতেই হ'ল। তাই ব'লে খুব সহজে করেন নি, বিনাসর্ত্তেও না—কারণ এই ক'টি লোককে নিয়েই সিপাহীরা জেরবার হয়ে পড়েছিল। কথা হ'ল পুরুষরা নিরাপদে নৌকো ক'রে এলাহাবাদে চলে যেতে পারবেন ও মহিলারা একটি প্রাসাদ আশ্রয় পাবেন, সিপাহীরাই তাঁদের আপাতত দেখাশুনা করবে—স্ত্রীলোক ও শিশুর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, দৈব করায় আর এক।

এলাহাবাদ ও কাশীতে নিষ্ঠুর বৈরনির্যাতনের সংবাদ এসে পৌঁচেছে তখন। প্রতিদিনই প্রতিশোধের নামে সেই ভয়াবহ পৈশাচিকতার অসংখ্য বিবরণ—হয়ত বা কিছু অতিরঞ্জিত হয়েই—কানে আসছে। এক্ষেত্রে এতগুলি ইংরেজের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের এই সদয় ও ভদ্র আচরণ অধিকাংশ সিপাহীই সমর্থন করতে পারলে না। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'হাতের মধ্য থেকে এই পিশাচগুলো বেরিয়ে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব?' এই মনোভাব অধিকাংশেরই। কর্তারা ইচ্ছা থাকলেও তাদের দমন করতে পারলেন না—কারণ তাতে কর্তৃত্বই চলে যাবার সম্ভাবনা। ফলে যখন সকলে

নৌকোয় চড়েছে তখন কূল থেকে গুলি-বর্ষণ শুরু হ'ল—খুব অল্প (বোধ হয় চার পাঁচ জনের বেশি হবে না) সংখ্যক ইংরেজই শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছতে পারল।

আর মহিলারা ?

যে বাড়ীটিতে তাঁদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল, যা পরে বিবিগড় প্রাসাদ বলে খ্যাত হয়েছে ইতিহাসে, একদা সেইখানেই তাদের হত্যা করে একটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল। প্রকাণ্ড কুয়া মৃতদেহে ভ'রে উঠল, তবু হত্যা-পিপাসা মিটল না।

সেদিন দু-একটি মহিলাও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। ইতিহাসে সে হিসেব নেই কোথাও।....

এই পর্যন্ত গেল ঐতিহাসিক বিবরণ। ইতিহাস যেখানে পৌঁছয়নি সেইখানে আমাদের গল্প।

সুদূর বাংলা দেশের হুগলী জেলার এক গ্রাম থেকে গিয়েছিল মিহির মুখুজ্জে—বাড়ী থেকে ঝগড়া ক'রে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উনিশ বছর বয়সে; হাঁটা-পথেই পশ্চিম যাত্রা করে, পথে রবাহূত এক বিবাহ-বাড়ী অতিথি হয়ে ছানাবড়া ও মোণ্ডা খাওয়ার প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাস্ত ক'রে গৃহ-কর্তার চোখে পড়ে যায়। তারপর তাঁরই নৌকোয় স্থান পেয়ে একদা পশ্চিমে পৌঁছয় এবং ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে আশ্রয় পায়।

আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের সারে অঞ্চল থেকে এসেছিল এড্‌ওয়ার্ড রলিনসন। সে-ও বাড়ী থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়েছিল একদা ভাগ্যান্বেষণে। তখন ইংরেজরা এরকম বেরিয়ে পড়েই আগে চেষ্টা

করত গাড়ীভাড়া জোগাড় ক'রে ভারতবর্ষে আসতে, নয়ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডন অফিসেই চাকৃরি দেখত। রলিনসনেরও সেদিন চাকৃরির অভাব হয়নি। তারপর—'একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কা ছিল বিধাতার মনে!' পঁচিশ বছরের ইংরেজ যুবকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের বাঙালী যুবকের প্রগাঢ় সখ্য হয়ে গেল।

হুইলারের নেতৃত্বে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ যখন পাঁচিল ও কাঁটাতারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করলে তখন এই নেড্ রলিনসনের জন্যই মিহির নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পারেনি। ও যদিচ কোম্পানীরই চাকরী করত তবু ভারতবাসী বলে সিপাহীদের হাতে সহজেই ছাড়া পেয়েছিল! ইচ্ছা করলে এ সব গোলমাল থেকে একেবারে অব্যাহতি পেতে পারত বাংলা দেশে যাত্রা ক'রে—কিন্তু মিহির মুখুজ্জে তা না ক'রে নিজে স্বেচ্ছায় সিপাহীদের দলে যোগ দিলে এবং নানা সাহেবকে জানালে যে জান কবুল করে ইংরেজ শিবিরের কার্য-কলাপের খবর এনে দেবে।

সন্দিগ্ধ নানা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেমন ক'রে?'

'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে মহামান্য পেশোয়া। ইংরেজ শিবিরে যাতায়াতে আমার কোন ভয় নেই।'

'তুমি যে ঠিক খবর আনবে তার প্রমাণ কি?

'একদিন ত প্রমাণ হবেই। তখন আমার জান নেবেন।'

'যদি তুমি ওখানেই থেকে যাও?'

'নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে? আমি কি এত আহাম্মক মহান্ পেশোয়া?'

তবু সন্দেহ যায় না পেশোয়ার।

'কী ছুতোয় যাবে ?'

'ওরা শুনছি খেতে পাচ্ছে না। বন্ধুর জন্য সামান্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। আমি যেন আপনাদের গোপন করেই যাবো—কোন মতে সকলের চোখ এড়িয়ে গেছি, এই সবাই জানবে। শুধু সেই হুকুমটা দিয়ে দিন।'

তাত্যা টোপী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। নানা সাহেব নিজে অত ঘোর-প্যাঁচের লোক নন—তিনি সুবেদার যশোবন্ত রাওকে ডেকে আদেশ দিলেন, 'এই বাঙ্গালীকে যদি ইংরেজদের বেড়ার ধারে ধারে যেতে ছ্যাখো ত ধর-পাকড় করার দরকার নেই। তার মানে দেখেও দেখবে না ওকে।'

মিহির আবারও ওঁকে প্রণাম করে বললে, 'একটা সিপাহীর পোশাক চাই হুজুর।'

ভ্রূকুঞ্চিত নানা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

'নইলে সিপাহীদের অবরোধ ভেদ ক'রে যাব অথচ কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, সন্দেহ করবে না—একথা ওদের বোঝাব কেমন ক'রে ? এ ধুতি-বেনিয়ান চলবে না হুজুর !'

'তা বটে। একে একটা পোশাক আর বন্দুক দিয়ে দাও। কিন্তু এত তোমার গরজ কেন বাঙ্গালী ছোকরা ?'

'স্বাধীনতা পেলে কি শুধু মারাঠীই পাবে—বাঙালী পাবে না ?'

'ঠিক আছে। তুমি যাও এখন।'

কিন্তু মিহিরের প্রাণ যদি বা সিপাইদের হাত থেকে বাঁচল, ইংরেজদের হাতেই যায় যায় হ'ল। ওকে এরা সন্দেহ করবে না—

এ তথ্যটা ত ঢাক পিটে যাওয়া যায় না। মিহির সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে এইটে বোঝাবার জন্যই ওকে অনেক কাণ্ড ক'রে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে যেতে হ'ল—নিঃশব্দে চোরের মত। ফল হ'ল এই যে বেড়ার কাছাকাছি যেতে ইংরেজের গুলি ছুটল ওর কাঁধের পাশ দিয়ে—এক চুলের জন্য কাঁধটা বাঁচল—যে ইংরেজকে ও তখনও দেখেনি কিন্তু সে দেখেছে। মিহির এর জন্য প্রস্তুতই ছিল। পকেট থেকে একটা সাদা পতাকা বার করে নাড়তে লাগল। তখন বেড়ার ধারে এগিয়ে এল দুজন পাহারাদার।

মিহির স্পষ্ট ইংরেজীতে বললে, 'ফ্রেণ্ড !'

'প্রমাণ ?'

'তোমাদের এডওয়ার্ড রলিনসনকে ডাকো। সে চেনে।'

রলিনসন এসে একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরলে, 'মাই ডিয়ার মিহির !…বাট হাউ—এলে কেমন ক'রে ?'

'সে অনেক কষ্টে—সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে। এই ছাখো তোমার জন্যে কি এনেছি—'

জামার নিচে পিঠের সঙ্গে বাঁধা খানিকটা কাঁচা মাংস বার করলে, আর বুকের দিকে বাঁধা খানিকটা আটা—। যে সব অন্য ইংরেজরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মতই জ্বলে উঠল। কতদিন টাটকা মাংস জোটেনি! রলিনসন ত মিহিরকে জড়িয়ে ধরে চুমুই খেলে গোটা কতক। বলল, 'মেপে খাবার খাচ্ছি কদিন, ক্ষিদে পেলেই জল—এই চলছে। আজ তোমার দয়ায় অন্তত পাঁচ সাত জন লোক খেতে পাবে।'

মিহির বললে, 'নেড্, একটু আড়ালে চলো—গোটাকতক কথা আছে।'

নিভৃতে গিয়ে সে কি ভাবে এবং কি সর্তে এসেছে সব খুলে বললে, তারপর বললে, 'তোমাদের অনিষ্ট না হয় এমন কয়েকটা খবর দাও, গিয়ে দিতে হবে। তা হ'লে ভবিষ্যতে সহজে আসতে পারব—চাই কি, বেশি ক'রেই কিছু আনতে পারব।'

নেড ভেবেচিন্তে দু-একটা খবর দিয়ে দিলে। কিন্তু বললে, 'মুখার্জি, অকারণ একটা ঝুঁকি নিও না। দু'দিক থেকেই তোমার ভয় আছে।'

'তা থাক্। মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেই আমার ভাল লাগছে। তা ছাড়া তুমি এখানে উপোস করবে আর আমি—। না, তা হয় না নেড।'

এডওয়ার্ডের চোখ ছল ছল করতে লাগল।

ফেরবার পথেও বার-দুই গুলির ঝাঁক চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। যারা জানে না—উভয় পক্ষেই এমন লোকের সংখ্যা ত কম নয়। তবু মিহির শিস দিতে দিতেই ফিরল!

নানা সাহেবের সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'তারপর?'

মিহির সংগ্রহ-করা খবরগুলি দিলে একে একে। নানা সাহেব খুশি হলেন। তার কারণ, কিছুক্ষণ পূর্বেই তাঁর এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর এসে যে খবরগুলি দিয়েছে তার সঙ্গে এর দুটো খবরের মিল ছিল।

নানা সাহেব ওকে পুরস্কার দিতে গেলেন, মিহির নিলে না। বললে, 'যেদিন আপনি দিল্লীর তখ্‌তে বসবেন সেদিন এটা নেব। আজ থাক পেশোয়া।'

আরও খুশী হয়ে নানা সাহেব একটা মোহরের আংটি ওর হাতে

দিয়ে বললেন, 'এইটে হাতে দিয়ে থেকো—অন্তত সিপাইদের হাতে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না।'

ওঁকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এল মিহির। নানা সাহেব না হোক্—ভারতবাসী আবার দিল্লীর তখ্‌তে বসুক, এ ইচ্ছা ওরও। কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে হবে, যেমন ক'রে হোক। বিশ্বাসঘাতকতা? মিহির মনকে বোঝালে যে সে ত কিছু কিছু খবরও এনে দিচ্ছে। তাতেই ওর অপরাধ কেটে যাবে।

এমনি ক'রে চলল কয়েক দিন। মিহির বহু খাদ্য নিয়ে গিয়ে ক্ষুধার্ত উপবাসী ইংরেজদের দিলে—কিন্তু সে ত ওর বন্ধুরই জন্য। তা ছাড়া এমন ক'রে মানুষ মারার সে সমর্থন করতে পারবে না কোন দিনই—

অবশেষে খবর এল—এরা ছাড়া পাবে, নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে এলাহাবাদ।

মিহিরই প্রথম সে খবর এনে দিলে ইংরেজ শিবিরে। দুঃখের মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবাইকার মুখ। কিন্তু রলিনসন মিহিরকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে, 'ভাই মিহির—অনেক উপকার করেছ, তোমার ঋণের শোধ নেই! তবু আমি জানি যা করেছ তা আমাকে ভালবাসো ব'লেই পেরেছ। সেই দাবীতে আর একটি অনুরোধ করব।'

'কী বলো!'

'নানারকম কথা শুনছি। হয়ত শেষ পর্যন্ত পালাতে পারবই না। যদি সবাই মরি ত দুঃখ নেই। তবে এমন যদি হয় যে

পুরুষদের মেরে ওরা মেয়েদের আটকে রাখে, তাহ'লেই সত্যকার বিপদ বুঝব। আমাদের প্রাণের চেয়ে—মেয়েদের ইজ্জৎ বড়, এটা ত মানো।·· আমাদের এখানে যে বিবিরা আছেন তার মধ্যে আছে ক্লারা ডবসন বলে একটি মেয়ে। পাদ্রীর মেয়ে, আঠারো উনিশ বছর বয়স। অপরূপ সুন্দরী—অন্তত আমার চোখে। তোমারও ভুল হবার কোন আশঙ্কাই নেই, সে মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায়। কথা ছিল তাকে বিয়ে করব—চাকরীতে একটু উন্নতি হ'লেই। আমি যদি মারা যাই, সত্যিই নিরাপদে পৌঁছব কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে সে বিষয়ে—ওকে তুমি একটু দেখো। যদি সবাইকে ছেড়ে দেয়, কিংবা ওকে অন্তত তুমি মুক্ত করতে পার ত এলাহাবাদে নিয়ে যেও কোন রকম ক'রে। সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর যদি না বাঁচি—তোমার বোন ব'লে মনে ক'রো—নিরাপদে কোন ইংরেজ আশ্রয়ে পৌঁছে দিও।'

রলিনসনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল—লজ্জিত হয়ে রুমালে মুছে নিলে তাড়াতাড়ি। মিহিরের চোখও শুষ্ক রইল না। সে বললে, 'প্রাণ দিয়েও যদি তার কোন উপকার করতে পারি ত করব ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

মনে তার একটু সন্দেহ ছিলই। সে দু'বেলাই শুনছিল, এলাহাবাদ ও কাশীর খবর। সে-সংবাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল বৈকি। সিপাইরা কি সহজে ছেড়ে দেবে ইংরেজদের? রক্তের বদলে রক্ত কি চাইবে না? বিশেষত এই কদিনেও কম বেগ ত দেয়নি এই কটা ইংরেজ! মিহির বিষণ্ণ-চিত্তেই বিদায় নিল বন্ধুর কাছে।

তাই—সেই আশঙ্কাই যখন শেষ অবধি সত্য হ'ল তখন আর চুপ করে থাকতে পারলে না সে। সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের পর মেয়েদের নিয়ে গিয়ে যখন বিবিগড়ে তোলা হ'ল, তখন সোজা নানাসাহেবের কাছে গিয়ে বললে, 'হুজুর এবার আর একটি ভিক্ষা।'

'কী বলো।'

মনটা ভাল ছিল না নানা সাহেবের। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে নিজেকে তিনি যেন অপরাধী ভাবছিলেন।

'বিবিগড়ের পাহারাদারদের মধ্যে আমার নামটাও লিখিয়ে দিন!'

'কেন?'

'অনেকরকম কথা কানে আসছে। মেমসাহেবদের সাদা চামড়ায় ভুলে কেউ কেউ নাকি চেষ্টা করছে ওদের ছেড়ে দেবার—'

'তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি ওখানেই থাকো গে। আমি জমাদারকে বলে দিচ্ছি—'

ওখানে থেকেও অবশ্য কোন সুবিধা হ'ল না। কারণ চারিদিকে লোক। শুধু দূর থেকে ক্লারাকে দেখে চিনে রাখলে মিহির—এই পর্যন্ত। প্রাণপণে নিজের মাথাকে খাটাতে লাগল—কোন উপায় কোথাও থেকে পাওয়া যায় কিনা, এরই চিন্তায়।

কিন্তু তার আর সময়ও ছিল না। হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর তাণ্ডব। সিপাহীদের একদল বিবিগড়ের স্ত্রীলোক এবং শিশুদের রক্ত নিয়ে নূতন হোলিখেলা শুরু করলে। মিহির ছুটে গেল নানাসাহেবের কাছে, তিনি দেখা করলেন না। তাত্যা টোপীও নেই। সেই সুযোগই নিয়েছিল সিপাহীরা।

একেবারে মরীয়া হয়ে উঠলে অনেক সময়ে মানুষ সামনে পথ

দেখতে পায়—যে পথ অন্য সময় কিছুতেই চোখে পড়ে না। ওদিকে কোন উপায় না পেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিলে মিহির। জীবন-মৃত্যুর খেলা—ইতস্তত করার অবসর নেই। খোলা তলোয়ার হাতে ক'রেই ছুটে এসে ঢুকল বিবিগড় প্রাসাদে। হত্যা না করুক, হত্যার অভিনয় করতে দোষ কি? কালান্তক যমের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল সে এঘর থেকে ওঘরে। চারিদিকে রক্তের বন্যা। রক্ত আর হাহাকার। হাত নিসপিস করছিল ওর—এই সব নারীহত্যাকারীদের বুকে নিজের তলোয়ারখানা বসিয়ে দেবার জন্যে। না হয় মরবেই শেষ পর্যন্ত, জীবনের পরোয়া সে করে না! কিন্তু কাজ যে বাকি এখনও—

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল ক্লারাকে। একটা জায়গায় নিভৃতে হাঁটু গেড়ে বসে বোধ করি বা ঈশ্বরকেই ডাকছে, ওকে সেই অবস্থায় এসে পড়তে দেখে একটা চীৎকার ক'রে উঠল ক্লারা, কিন্তু কোন আওয়াজই শেষ পর্যন্ত বেরোল না। কেমন একটা অসহায় আর্ত চাপা শব্দ উঠল মাত্র। মিহির কাছে এসে বলল, 'কোয়ায়েট ক্লারা, য়্যাম ইওর ফ্রেণ্ড্।'

ক্লারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু তখন আর বেশী কথার সময়ও নেই। রলিনসনের যাবার আগে দিয়ে যাওয়া এক টুকরো চিঠি জুতোর মধ্য থেকে বার ক'রে ক্লারার হাতে দিল। তাতে ইংরেজীতে লেখা—'ক্লারা এ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। একে বিশ্বাস করো'। তবু ক্লারার সংশয় যায় না। অন্য কোন বন্ধুর হাতে নেড্ দিয়েছিল হয়ত এ চিঠি—তাকে মেরে এই নেটিভ সিপাই পেয়েছে ওটা। হয়ত আরও বেশি রকমের কোন শয়তানী মতলব আছে।

ওর চোখে সেই সংশয় আর অবিশ্বাস পড়ে মিহির ম্লান হাসল। বলল, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আর তোমার কি ভয় ক্লারা! কিন্তু তুমি আমার নাম শোননি?—আমি মিহির।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলে ক্লারা। শুনেছে বৈকি—বহুবার শুনেছে। কম্পিত-কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু নেড্ কি বেঁচে আছে? এ চিঠি কবেকার?'

'এ চিঠি যাবার আগে দেওয়া। তবে নেড্ বোধহয় বেঁচে আছে।' মিছে ক'রেই বলে মিহির।

'তবে যে শুনছি কেউ বাঁচেনি।'

'কে বলল? দশ বারো জন অন্তত পালিয়েছে। হয়ত কিছু বেশিই হবে। নেড্ লাকী, নিশ্চয়ই বেঁচেছে। কিন্তু ঐ ওরা এদিকে আসছে—আর যে সময় নেই।'

হু হু ক'রে কেঁদে উঠল ক্লারা, 'কী হবে আমার বেঁচে মিহির? মা বোন সব গেল। হয়ত বাবাও—'

'কিন্তু নেড্। নেড-এর কথা ভাবো। হয়ত সে তোমার জন্যই প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছে—'

মন্ত্রের মত কাজ করল কথাটা। নিমেষে শান্ত হয়ে ক্লারা প্রশ্ন করলে, 'বেশ, বলো কী করতে হবে।'

'মৃত্যুর অভিনয় করতে হবে। একমাত্র মরেই তুমি মৃত্যুর হাত এড়াতে পারবে আজ।'

ততক্ষণে পাশের ঘরে একটা উন্মত্ত কোলাহল উঠেছে। আর এক মুহূর্তও অবসর নেই। হিড় হিড় ক'রে ক্লারার একটা হাত ধরে

টানতে টানতে নিয়ে চলল মিহির। যতদূর সাধ্য মুখে পৈশাচিক শোণিত-তৃষা ফুটিয়ে তুলল।

'আরে এ বাংগালী ভাইয়া! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ শিকার?'

'চুপ। এ আমার শিকার। আমি মারব।' দাঁতে দাঁত চেপে বলে ক্লারাকে, 'তুমি কাঁদো, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করো! অভিনয়টা পুরো হওয়া চাই!'

তবু একটা লোক ক্লারার রূপের আকর্ষণে রুখে এসেছিল ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে—নানাসাহেবের আংটিটার কথা মিহিরের মনে পড়ে গেল হঠাৎ। মন্ত্রর মত কাজ করল। মাথা নীচু ক'রে সরে পড়ল।

মিহির তার তলোয়ার আগেই কোন মৃতা ইংরেজ রমণীর রক্তে রাঙ্গিয়ে নিয়েছিল—এখন আবার ও একটা কাটা গলা থেকে তাজা রক্ত মাখিয়ে নিলে, তারপর সেই বিরাট কুয়াটার কাছে যেতে যেতে তেমনিই চাপা গলায় বললে, 'তুমি শুধু রাতটা পর্যন্ত বেঁচে থাকবার চেষ্টা ক'রো। তোমাকে ওখানেই ফেলব তবে অনেক দেহ জমে উঠেছে, লাগবে না। ওপরেও দুচারটে পড়বে। তুমি নিচে পৌঁছে এক কোণে সরে যেও—আর নিঃশ্বাস না আটকায় সেইটে দেখো। আমি রাত্রে আসব।'

শিউরে উঠে ক্লারা বললে, 'ঐ অতগুলো শবের মধ্যে আমি গভীর রাত পর্যন্ত পড়ে থাকব? আর ও আমারই আত্মীয়া ও বান্ধবীর শব! সে আমি পারবো না!'

'উপায় নেই ক্লারা, দেখছ না পিশাচেরা ক্ষেপেছে। দেখছ না নরকের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বাঁচতে গেলে মরতেই হবে এখন। প্রাণপণে শুধু তুমি নেড-এর নাম স্মরণ করো—তার কথা ভাবো।'

আরও কারা কাছে আসছে। কথা কইবার আর সময় নেই। সেই তলোয়ারের রক্ত তুলে ওর জামায় মাখিয়ে দিয়ে, ভান করলে ওর বুকে তলোয়ার বসাবার, তারপর যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ওকে ফেলে-দেবার মত ক'রেই নামিয়ে দিলে।

'ঈশ্বর জানেন নেড্—এছাড়া উপায় নেই!' অস্ফুট কণ্ঠে বললে মিহির।

গভীর রাত্রে স্তব্ধ হয়ে এল নররক্ত-পিপাসুদের বীভৎস হুঙ্কার। বিবিগড় প্রাসাদ থম্ থম্ করছে। সিপাহীরা ক্লান্ত হয়ে শহরে গেছে মদ খেতে। আর পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই! স্বয়ং মৃত্যুর জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েছে বন্দিনীদের।

তারই মধ্যে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চরণে, ছায়ার মত অন্ধকারে গা মিলিয়ে এগিয়ে এল মিহির।

ভয়?

হ্যাঁ—তারও ভয় আছে বৈ কি! ভয় আর ঘৃণা। ক্ষোভ আর দুঃখে তার আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে এসেছে। তার ওপর সারা দিনের উপবাস। তবু এখানে আসবার আগে সে জোর ক'রেই একটু জল খেয়ে এসেছে। গুড় আর জল; নইলে গায়ে জোর পাবে কেন?

আলো নেই, জ্বালাও যাবে না। কেউ নেই হয়ত কাছে, কিন্তু যদিই কেউ আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে কৌতূহলী হয়ে! এক গাছা দড়ি এনেছে, দড়িটা কুয়ার পাথরে লাগানো একটা লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, সেই দড়ি ধরে নামবে।

শৃগালের দল এরই মধ্যে জমায়েৎ হয়েছে! তবে তাদের

খাদ্য চতুর্দিকে—কুয়ার কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওর পায়ের আওয়াজে দু'চারটে ছুটে পালাল, ওরাই যা জীবিত আছে এখানে।

আস্তে আস্তে নেমে গেল মিহির। ভয় হচ্ছে যদি বহু মৃতদেহ চাপা পড়ে থাকে ক্লারা, কেমন ক'রে বার করবে তাকে? এতগুলো শব সরাবে কোথায়? তা ছাড়া—যদি তার দম বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে?…মিহিরের যেন কান্না পেতে লাগল, কি দরকার ছিল তার এত ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার?

একটু যেতেই পা লাগল—হিম শীতল মৃতদেহ এবং চট্‌চটে রক্তে—অর্থাৎ ক্লারাকে ফেলবার পর বহু দেহ পড়েছে আরও। যা ভয় করছিল তাই। হে ঈশ্বর, সে এখন কী করবে!

কিন্তু ঐ কী একটা আওয়াজ হ'ল না? মুহূর্তে যেন হিম হয়ে এল বুকটা। না—জীবিত প্রাণীরই শব্দ। ঐ যে, কে একটা অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, 'মাই গড!'

'ক্লারা! ক্লারা! কোথায় তুমি!'

'এসেছ মিহির? এসেছ? ও, আর যে পারি না আমি।' প্রায় চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল ক্লারা। এতক্ষণের সমস্ত অমানুষিক দুঃখ যেন বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল সেই কান্নার সঙ্গে।

'চুপ! চুপ! চুপ করো ক্লারা লক্ষ্মীটি! এত দুঃখ-বহনের যন্ত্রণা এক-মুহূর্তের ভুলে ব্যর্থ ক'রে দিও না!'

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এক সময় হাতে ঠেকে উষ্ণ জীবন্ত একটি হাত। ছেলেমানুষের মতই টেনে বুকের মধ্যে এনে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, 'আর একটুখানি ধৈর্য ধরো ক্লারা, লক্ষ্মী বোন্‌টি!'

রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে এক রকম জোর ক'রেই রুমালটা ওর মুখে গুঁজে দেয়। তারপর ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওঠা সামান্যই—কিন্তু এক হাতে অত বোঝা নিয়ে কি ওঠা যায়? কোনমতে একটু একটু ক'রে এগোয় সে।

ওপরে এনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিতেই ক্লারা টলে পড়ে গেল।

'ক্লারা! দাঁড়াতে পারবে না বোন?'

মুখের রুমালটা কোন মতে সরিয়ে ক্লারা বললে, 'অসম্ভব, আমার হাতে-পায়ে কোন জোর নেই। আর চেষ্টা ক'রেও কোন লাভ নেই, আমি বোধ হয় শিগ্‌গিরই পাগল হয়ে যাবো। তুমি একমাত্র দয়া আমায় করতে পারো মিহির—যদি ঐ তোমার কোমরের ছুরিটা আমার বুকে বসিয়ে দাও। আত্মহত্যাও করতে পারতুম—কিন্তু কোন অস্ত্র ছিল না হাতের কাছে—'

'চুপ! চুপ! অধৈর্য হয়ো না। নেডএর খবর পেয়েছি, সে বেঁচে আছে। তার কথা ভাবো!'

মিছে ক'রেই বলে মিহির।

ক্লারা কি একটু আশ্বাস পায় সে নামে? অন্তত শান্ত হয় অনেকটা। মিহির বললে, 'আমার গায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে?'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে ক্লারা বললে, 'না, সমস্ত পা কাঁপছে, কোন জোর নেই। আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করো না মিহির, তুমি যাও—'

নিমেষে ওকে পিঠে তুলে নিলে মিহির, বস্তার মত। হাত দুটো সামনে এনে নিজের দুহাতে চেপে ধরে হেঁটে চলল। ঈষৎ সামনের

দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিল, নইলে দীর্ঘাঙ্গী ক্লারার পা মাটিতে ঘষে যায়।

ব্যাকুল হয়ে ক্লারা বলতে লাগল, 'পারবে না, পারবে না মিহির! এ অবস্থায় কখনও পথ হাঁটতে পারো? আমাকে ছাড়ো, নয়ত পথের ধারে কোনও ঝোপে ফেলে রেখে যাও—। আমি কথা দিচ্ছি বাঁচবার চেষ্টা করব। ও, ডিয়ার বয়!'

কথার উত্তর দেবার সময় নেই। যে কোন সময় যে কোন লোকের সামনে পড়তে পারে। তাহ'লে তুজনের কারুর রক্ষা থাকবে না। ঘন আমবাগানের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে মিহির এগিয়ে চলল। ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে, এই অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ঝুঁকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে · তবু যেতেই হবে।

এ কী বিড়ম্বনা ওর! অষ্টাদশী তরুণীর দেহলতা ওর দেহের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে আছে. তার ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগছে ওর গালে, সোনালী চিকন চুল গেছে ওর মুখের ঘামে জড়িয়ে—তার নরম গাল ওর গলার এক পাশে লেগে—এক যুবকের জীবনে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা কি ঘটতে পারে? কিন্তু সেটা ভাল ক'রে অনুভব করারও অবসর নেই যে ওর!

দীর্ঘ ক্রোশব্যাপী আমবাগান শেষ হয়ে শহরের উপকণ্ঠে মাঠ। তারই আলের উপর দিয়ে যেতে হবে। নক্ষত্রের আলোয় তাকে দেখা না গেলেও ক্লারার শুভ্র পোষাক বহুদূর থেকেই বোঝা যাবে। তবে তারও ব্যবস্থা করেছে বৈ কি মিহির। 'বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি পুকুর আছে। বাঁধানো চবুতারায় অর্ধমূর্ছিতা ক্লারাকে এনে নামিয়ে নিজেও কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসল

সে ক্লান্তিতে দেহ অনড় হয়ে আসছে। আর বোধ হয় চলা সম্ভব নয়।

তবু, তবু উঠতেই হবে। পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ক'রে জল এনে দিলে ক্লারার মুখে-চোখে মাথায়। ব্যাকুল অসহ তৃষ্ণায় পশুর মত হাঁ ক'রে সেই জল পান করলে ক্লারা। তারপর যেন একটুখানি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বসল।

'একটু কি ভাল বোধ করছ ক্লারা ?'

ঘাড় নেড়ে সে জানল, 'হ্যাঁ।'

একটা বড় আম গাছের ডালে পাতার ফাঁকে লুকোনো ছিল একপ্রস্থ সিপাহীর পোশাক, পেড়ে এনে মিহির বললে, 'এইটে যে পরতে হবে তোমাকে এখন !'

ক্লারা শিউরে উঠল সেদিকে চেয়ে, 'সিপাইর পোশাক ?'

'হ্যাঁ ক্লারা—এ অবস্থায় যার সামনে পড়বে নিশ্চিত মৃত্যু। তোমার আমার তুজনেরই। এই পোশাক আর ঐ পাগড়ী পরিয়ে ছোক্‌রা সিপাই সাজিয়ে নেব তোমাকে। রং আছে তৈরী, মুখটাও তামাটে ক'রে দেব আমাদের মত।'

যন্ত্রচালিতের মতই পোশাকটি হাতে নিলে ক্লারা, কিন্তু কিছুতেই যেন পরতে পারে না। এ দিকে সময় চলে যাচ্ছে ! অসহিষ্ণু হয়ে উঠে মিহির বললে, 'তাহ'লে অনুমতি করো ক্লারা, তোমার পোশাক আমিই বদলে দিই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কোন লজ্জা, কোন অপমান বোধ ক'রো না !'

আবার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে সে, 'শুধু বাঁচবার জন্য কী না করলাম মিহির, কী না করলাম ! শবগুলো পড়েছে কয়েকটা ক'রে—

আর আমি নিঃশ্বাস রোধ হবার ভয়ে তাদের নিচে ফেলে ওপরে উঠে এসেছি, যেমন জলে ভেসে ওঠে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। প্রাণপণে এই যুদ্ধ করেছি নিজের বিবেকের সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্বের সঙ্গে। পাগলও যদি হয়ে যেতুম—তাহ'লেও রক্ষা পেতুম। আর যে পারছি না আমি! আমার সমস্ত দেহ মন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ওঃ—কত নীচ আমি; তুচ্ছ প্রাণটার জন্যে সকলকে মরতে দেখেও বাঁচবার কী চেষ্টা!'

মিহির আর অপেক্ষা করল না। এ ত উন্মাদই—এর কাছে আর সঙ্কোচ কিসের?

সে ওর পোশাক ছাড়িয়ে কোনমতে সিপাহীর পোশাক পরিয়ে দিলে, মুখে রং ক'রে তার ওপর দিলে খানিকটা ধুলো মাখিয়ে। তারপর পাগড়ী পরিয়ে চুলটা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে, সস্নেহে ডাকলে 'ক্লারা।'

ক্লারা কিন্তু ততক্ষণে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে উঠেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল, 'চলো, কতদূর যেতে হবে?'

'বেশী দূর না। আর ক্রোশখানেক হেঁটে গিয়েই নৌকো পাবো। নৌকো ঠিক করা আছে।'

প্রায় সমস্ত দেহের ভার মিহিরের ওপর এলিয়ে দিয়ে ক্লারা হাঁটতে লাগল। মিহিরও এক রকম ওকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল। ভোরের আগে এ পথটা পার হয়ে যেতেই হবে। দিনের আলোয় ছদ্মবেশ ধরা পড়তে পারে।

এলাহাবাদে পৌঁছে ইংরেজ আশ্রয় পাওয়া গেল বটে কিন্তু

রলিনসনের কোন খবর নেই। পাঁচ-ছ'দিন প্রায় দিন-রাত খুঁজল মিহির—যদিও আশা ছিল খুবই কম।

যাঁর আশ্রয়ে ক্লারা ছিল তিনি বললেন, 'মুখার্জি, বৃথা খোঁজ করছ—আমার মনে হয় সে আর নেই।···যাক্—তুমি যা করেছ তার জন্য সমগ্র ইংরেজ জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু ক্লারার জন্য তুমি আর ভেবো না। ওকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবার ভার আমার! তুমি নিজের কাজ ক্ষতি ক'রো না।'

বোধ হয় ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে ভারতীয় যুবকের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত হয়েই উঠেছিলেন তিনি।

মিহিরও কথাটা বুঝল। এই ক-বছর সে বৃথাই ইংরেজের সাহচর্য করেনি। সেই দিনই অপরাহ্লে ক্লারার সঙ্গে নিভৃতে দেখা ক'রে বললে, 'ক্লারা, আমি আজই শেষ রাত্রে কাশী রওনা হচ্ছি। সেখানেও রলিনসনকে খুঁজব, যদি পাই ত এখানের ঠিকানা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব তখনই—'

একটু থামল মিহির! তারপর কি বলবে ভাবতে লাগল সে। কিন্তু ক্লারা তাকে কথাটা শেষ করতে দিলে না, 'যদি না পাও? মিহির!'

মাথা নিচু ক'রে মিহির বললে, 'তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি—এইটুকুই তখন আমার সান্ত্বনা থাকবে। আমাকে দেশের দিকে ফিরতে হবে ক্লারা!'

'তার—তার মানে—'যেন আর্তনাদ করে উঠল ক্লারা, 'তোমার আর দেখা পাবো না?'

'আর কি আমাকে কোন প্রয়োজন আছে তোমার? কোন

কাজ থাকে ত নিশ্চয়ই ফিরে আসব।' অন্য দিকে চেয়েই মিহির উত্তর দিলে।

ক্লারা একটু এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরল। চোখে তার বিচিত্র এক দীপ্তি, সেই চোখ-দুটি ওর চোখের উপর রেখে কম্পিত গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমি, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না মিহির!'

সে চাহনির অর্থ ভুল হবার নয়। মিহির প্রায় শিউরে উঠে বললে, 'ক্লারা, তুমি আমার বন্ধুর বাগ্‌দত্তা। আমার ভগ্নির মত—'

'সে ক্লারা মরে গেছে, রলিনসনও সম্ভবত মৃত। এ ক্লারাকে নব-জন্ম দিয়েছ তুমি, এখন আমার ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। মিহির, তুমি কি বুঝতে পারছ না, এই ক-দিনে তুমি—তুমি আমার আত্মার সঙ্গে—সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছ? হ্যাঁ—রলিনসনকে আমি ভালবাসতাম—কিন্তু সেটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র, তোমাকে পেয়ে বুঝেছি ভালবাসা কাকে বলে। তুমি অদ্ভুত, তুমি অপূর্ব—তুমিই আমার ঈশ্বর মিহির!

'ক্লারা, ক্লারা, এমন ক'রে আমায় লোভ দেখিও না, তোমার ঈশ্বরের দোহাই!' কেঁপে যায় মিহিরের গলা, তালু শুষ্ক হয়ে ওঠে—'ভেবে ছাখো তোমার সমাজ আর আমার সমাজে আকাশ পাতাল তফাৎ। ধর্ম আলাদা, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। এতে তুমি সুখী হ'তে পারো না। তোমার সমাজ তোমাকে ঘৃণা করবে, আমার সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে! নতুনের মোহ যখন কাটবে আমরা দুজনেই অভিশাপ দেব পরস্পরকে—জীবন আমাদের দুর্বহ হয়ে উঠবে।'

ক্লারা ওকে জড়িয়ে ধরল সবেগে, উত্তপ্ত পিপাসু দুটি ওষ্ঠ ওর মুখের কাছে এনে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'সমাজ ছেড়ে

লোকালয় ছেড়ে চলো আমরা গহন অরণ্যে কোথাও চলে যাই। হিমালয়ে, সমুদ্রতীরের কোন জেলেদের গ্রামে—যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। আমার ত আর কেউ নেই তুমি জানো। এখন তুমিও আমাকে আর ত্যাগ ক'রো না। যা জুটবে তাই খাবো, আমি তোমাকে পরিশ্রম ক'রে খাওয়াবো। তুমি আমার রাজা, আমার দেবতা—আমাকে শুধু সেবা করার অধিকার দাও।'

স্বপ্নের ঘোর লাগে কি মিহিরের মনে ?

সে যেন নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে।

'তা হয় না ক্লারা। আমাকে বিদায় দাও। এই যদি সত্য হ'ত ত আমি সানন্দে সব ত্যাগ ক'রে তোমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতাম। তুমি রাজার জাতে জন্মেছ ; বিলাস ও ঐশ্বর্যে মানুষ, দুঃখ তুমি বেশি দিন সইতে পারবে না আমি জানি।···তা ছাড়া, আমি এদেশি লোক, ইংরেজ অনেক দুঃখ পেয়ে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠেছে, তোমাকে নিয়ে আমি যদি বাস করি ত তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের দুজনকেই পুড়িয়ে মারবে। তার চেয়ে এই ভাল ক্লারা, ডার্লিং—আমি যে তোমার জীবনরক্ষা করতে পেরেছি, পেয়েছি অন্তত একদিনেরও ভালবাসা—এই আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাথেয় হয়ে থাকবে।'

কেমন একটা যেন আচ্ছন্নভাবে কথা বলে ক্লারা, 'তুমি বিপদে পড়বে ঠিকই। এরা কখনও ক্ষমা করবে না। এখনই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।...তবে থাক্। কিন্তু তুমি কেন আমাকে এমন ক'রে বাঁচালে মিহির ? সবাই গিয়েছিল তবু তুমি ছিলে—এতেই নতুন আশায়

সঞ্জীবিত হয়ে ছিলাম! এখন কী নিয়ে থাকব? কি রইল আমার জীবনে? ওঃ—ঈশ্বর! ঈশ্বর!'

আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো খুলে নামিয়ে দেয় মিহির। নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় জীবনের সব চেয়ে শ্রেয় ও রমণীয় বন্ধন থেকে। তারপর চেষ্টা করে ক্লারার সেই আচ্ছন্নভাবের সুযোগে নিঃশব্দে সরে যাবার।

কিন্তু সে দরজার কাছাকাছি পেঁছতেই ক্লারার যেন চমক ভাঙ্গে। ছুটে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়, 'তোমার ঠিকানাটাও কি আমাকে দেবে না? দেবে না কোন স্মৃতি-চিহ্ন?'

'লাভ কি?' ম্লান হাসি হাসে মিহির, শুধু শুধু দুঃখকে বাড়ানো। ...তার চেয়ে ভুলে যাবারই চেষ্টা ক'রো ক্লারা। দেশে গিয়ে নতুন নতুন মানুষ পাবে। তারাই তোমার স্বজন। অল্প বয়স তোমার —দুঃখ ভুলতে পারবে সহজেই। মিছিমিছি বন্ধন রেখে যেও না। তা ছাড়া, হয়ত এখন তুমি চিঠি দেবে ঘন ঘন, এর পর যখন কমে আসবে সে চিঠির সংখ্যা, আমি অত্যন্ত আঘাত পাবো। তার চেয়ে এতে তবু এই আশ্বাস থাকবে আমার যে, তুমি আমাকে ভোলনি!'

'আশ্বাস!' সাগ্রহে উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে ক্লারা, 'তাহ'লে তুমি কি আমাকে মনে রাখবে মিহির?'

'তোমাকে ভোলা কি সম্ভব? আমাকে ভুল বুঝো না ক্লারা, আমার দেহটা শুধু থাকবে এখানে, আমার মন আর আত্মা দুই-ই তুমি নিয়ে যাচ্ছ চিরকালের মত!'

'আর কিছু আমি চাই না মিহির। এই দুটো কথা—হয়ত মিছে

কথা, হয়ত শুধুই বৃথা আশ্বাস—তবু এই রইল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিচিহ্ন। আর আমি বাধা দেব না। তুমি যাও।'......

স্খলিত মন্থরপদে মিহির যখন বেরিয়ে এল ওদের বাড়ি থেকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকের প্রান্তর ঘিরে। চারিদিকের বাড়িঘর সে আঁধারে অস্পষ্ট একাকার হয়ে গেছে। মিহিরের মনে হ'ল এ অন্ধকার যেন নামল ওর অন্তরেই—চিরকালের মত। জীবনের যা কিছু আলো স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় নিভিয়ে দিয়ে এল সে এই মাত্র।

থেমে যাওয়া সময়

এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা মজার খবর বেরিয়েছিল। আসামের জঙ্গলে নাকি কয়েক লক্ষ বৎসর আগেকার স্যাঁৎসেতে বাষ্পে-ঢাকা আব্‌হাওয়ার মধ্যে সেই সময়কারই অতিকায় জন্তু দেখতে পাওয়া গেছে! খুব ঢ্যাঙ্গা মানুষও নাকি তার পায়ের হাঁটু ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে না—আর সে জন্তুটা নাকি বিরাট বটগাছের সব চেয়ে উঁচু ডাল থেকে কচি কচি ডগা ভেঙ্গে খায়।

সে এক বিরাট হৈ-চৈ কাণ্ড! আসাম সরকার বিলেতে লোক পাঠালেন বিশেষজ্ঞ আনতে। এখানকার প্রাণি-বিজ্ঞানবিদ্ ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলেন। খবরের কাগজের লোক ছুটল ক্যামেরা নিয়ে। পুলিশ ছুটল স্থানীয় অধিবাসীদের সামলাতে, পাছে তারা অমন জন্তুটাকে মেরে ফেলে। চিড়িয়াখানায় সোরগোল, ইতিহাসের পাতা থেকে সেই প্রাণীর কাল্পনিক ছবি নিয়ে রাস্তার মোড়ে জটলা! কেউ বলল গাঁজা, কেউ বললে, 'না হে হিমালয়ান রিজ্যনে সবই সম্ভব। ওর ঐ বিরাট গহ্বরে কি আছে কে বলতে পারে! মনে নেই? সেই তুয়াসে'র জঙ্গলে কুড়ি ইঞ্চি পায়ের ছাপ, কে যেন সাত ফুট মানুষও দেখেছিল? ও-ও ত তোমার সাব-হিমালয়ান রিজ্যন, আধা হিমালয়ান অঞ্চল।'

এমনি ক'রে জল্পনা-কল্পনা উদ্বেগ-তুশ্চিন্তা এবং বাজী-রাখারাখির শেষ রইল না একেবারে! কত খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর্যন্ত বেরিয়ে গেল! একগাদা টাকা খরচ করে মার্কিন হুজুগে-

বড়লোকেরা—মানে যাদের এমনি হুজুগ ছাড়া পয়সা খরচ করবার অন্য পথ নেই—হাওয়াই জাহাজ চেপে ছুটে এল মজা দেখতে, আরও কত কি !

তারপর এক সময়ে আবার সব জুড়িয়ে গেল ! ঠিক কী হ'ল, ব্যাপারটার কোন তদ্বির হ'ল কি না তাও জানা গেল না। আসাম গভর্ণমেণ্টও কোন বিবৃতি দিলেন না ভাল ক'রে এ সম্বন্ধে। হয়ত বা সরকারী ফাইলের মধ্যে ধামা-চাপাই পড়ে গেল ব্যাপারটা ! তুচ্ছ ছোটখাটো ঝগড়া, জাতিগত স্বার্থের কচকচির মধ্যে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক বিপর্যয়ের সংবাদ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল, ও সব নিয়ে কে এখন মাথা ঘামায় ? তুমিও যেমন ! শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল যে ওটা গাঁজাই—অর্থাৎ গাঁজাখুরী খবর।

এরই মধ্যে অমিয় ভাতুড়ী একদিন আমার কাছে এসে হাজির। পরণে হাফ্ প্যাণ্ট, খাকি বুশ-শার্ট, কাঁধে একটা কাঁধ ঝোলা—তাতেই একটা পাত্লা কম্বল ঝোলানো ! একেবারে এক্স্পিডিশনের বেশ !

'ব্যাপার কী রে ?' প্রশ্ন করলুম।

'চললুম।' শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে !

'কোথায় ? কেন ? কবে ?' একসঙ্গে আবার প্রশ্ন করি।

'আজই যাচ্ছি—আসাম মেলে। আর মাত্র একঘণ্টা সময় আছে। যদি আর না ফিরি মাকে একটু দেখিস'—নাটকীয়ভাবে বলে সে থামল।

কিছুই বুঝতে পারি না ব্যাপার কি। ব্যাকুল ভাবে বলি, 'কিন্তু হ'লটা কি, যে জন্যে একেবারে উইল ক'রে যেতে হচ্ছে ?'

'যাচ্ছি হিমালয়ের জঙ্গলে সেই অতিকায় জন্তু দেখতে। কী

জানি—বলা ত যায় না, ওখানে নানারকম জন্তু আছে, গণ্ডারও হয়ত পাওয়া যায়, ভালুকের ত কথাই নেই, তার ওপর সাপ—বড় বড় ময়াল, পাইথন!'

সে চোখ বড় বড় ক'রে সংবাদটা দিলে, অর্থাৎ আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা।

'কিন্তু তুই তা ব'লে এই অসময়ে পড়াশুনো ছেড়ে একা চললি কি করতে? তোর কি এখন এই সব বুনো হাঁস তাড়া ক'রে বেড়াবার সময়? তা ছাড়া তুই মায়ের এক ছেলে। এই ছুতোয় বাড়ি থেকে পালাচ্ছিস।'

'ছুতো নয় রে ছুতো নয়। গভর্ণমেণ্ট ত কিছু করলে না—যদি আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারি ত, শুধু যে আমারই একটা অক্ষয় কীর্তি থেকে যাবে তাই নয়—এই সব মুর্খ গভর্ণমেণ্টদেরও কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে!'

'ও! তুই সেই গাঁজার পেছনে ছুটছিস—পড়াশুনা সব কামাই ক'রে? ও ত স্রেফ গাঁজা! শুনিস্‌নি পুলিশ অনেক কষ্ট করেও সে জন্তু ত দূরে থাক, সে রকম কোন জায়গাই খুঁজে পায়নি!'

'আরে ওরা ত কাজ করে হুকুম তামিল করতে হবে ব'লে তাই। ওরা মুর্খ, ওদের সাধ্য কি এসব ব্যাপারের মর্ম বোঝে? এতে যে সমস্ত মানব-ইতিহাসের তত্ত্বটা বদলে দিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ওদের? না জ্ঞান কী বস্তু তাই বোঝে? তা বলে আমি ত আর চুপ ক'রে থাকতে পারি না।'

'কেন তুমিই বা এমন কি মাতব্বর?' বিদ্রূপ করি ওকে, 'এত সব রথারথী থাকতে—'

অমিয় বাধা দিয়ে বললে, 'তা নয়। বেশ মনে আছে, অনেকদিন আগে, মানে মরবার কিছু আগে বাবা একটা অদ্ভুত গল্প করেন। সে একজন যেন মিষ্টার দাস না রায়, সুধীর বাবুর বইয়ের দোকানে বসে ঐ গল্প করেছিলেন—এখন থেকে ঠিক বিশবছর আগে, আর বাবা যখন বলেছিলেন তখন থেকেও চৌদ্দবছর আগে। সে ভদ্রলোক সরকারী কাজে একবার নাকি নাগাদের দেশে গিয়েছিলেন। সাধারণত যে সব কর্মচারী যায়,—কোন মতে কাজ সেরে শহরে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে, ঠিক সে রকম তিনি ছিলেন না, তাঁরও মনে এসব ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে কী কী দেখবার জিনিস আছে, স্থানীয় ইতিহাস যদি কিছু পাওয়া যায়, কোন্ শিল্প সেখানকার বিখ্যাত, মানুষদের জীবন-যাত্রার ধরন কি—এসব খোঁজ করতেন। একবার তিনিই খোঁজ করতে করতে এক নাগাদের গাঁয়ে গিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগেও একবার এসেছিলেন তিনি। তখন সেখানকার সর্দারের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব হয়েছিল। পরিচয় ত ছিলই—তার ওপর এবার আবার তিনি সঙ্গে বিস্তর উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলেন, ছুঁচ-সূতো, বোতাম, চায়ের কাপ, কাঁচকড়ার মালা, তাস—এই সব। সর্দার খুব খুশি হয়ে গ্রামের অতিথিশালায় তিন দিন ওঁকে ধরে রাখে, একজোড়া হাতির দাঁত আর ভালুকের চামড়া উপহার দেয়, আর শেষদিনে বলে যে তুই কেবল এসে বিরক্ত করিস—কী নতুন জিনিস আছে দেখাবার জন্য, তা যাবি এক জায়গায়? ও ভদ্রলোক ত খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। সর্দার বললে, পথ খুব দুর্গম কিন্তু, একদিনের রাস্তা! উনি বললেন, তা হোক্। তখন সে নিয়ে গেল ওঁকে নিবিড় জঙ্গলের

মধ্যে দিয়ে দিয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। ন' ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটে, তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার দু'ঘণ্টা হেঁটে, সন্ধ্যার কিছু পরে গিয়ে পৌঁছলেন একটা জায়গায়। সেখানে কোন আশ্রয় নেই। একটা পাহাড়ের গুহার সামনে আগুন জ্বেলে রাত কাটাতে হ'ল। আবার পরের দিন ভোরে অল্প একটু জঙ্গল ভেঙ্গে সে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে এখনও জলা স্যাঁৎসেতে—সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনের মত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড় গাছের ডালপালা ভেদ ক'রে সূর্যকিরণ আসে না সেখানে কখনও, আর সর্বদা একটা ধোঁয়া-ধোয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। সেই রকম স্থানে অনেকক্ষণ একটা গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করার পর দূরে পাঁকের মধ্যে বিরাট কি একটা আলোড়ন উঠল, যেন একপাল হাতী জলে নেমেছে। সর্দার তাঁকে ইশারা ক'রে জানালে যে—ঐ আসছে। তারপর আরও খানিকটা পরে আওয়াজটা যখন কাছে এল তখন হঠাৎ সে আঙুল দিয়ে দেখালে—ঐ। ভদ্রলোক চেয়ে দেখেন সে একটা পাহাড় যেন হেঁটে হেঁটে আসছে! অবশ্য খুব কাছে সে আসেনি, এলে বিপদ হবে জেনেই সর্দার এমন জায়গায় বসেছিল, যেখানে সে আসে না। কিন্তু যতটা দেখা গিয়েছিল তাতে মনে হয় গিরগিটির মত একটা অতিকায় প্রাণী, মোটে দুটো পা, বিরাট গলা বাড়িয়ে প্রকাণ্ড মহীরুহের ওপর থেকে কচি পাতা খাচ্ছে আর ল্যাজের ঝাপটে কাদা ছেটকাচ্ছে। সেই মূর্তি দেখেই ত তাঁর হয়ে গিয়েছিল—তিনি সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট! সর্দারও জন্তুটাকে প্রণাম ক'রে সরে পড়ল। সে বলেছিল যে উনি নাকি কোন্ দেবতা!'

এই পর্যন্ত বলে অমিয় থামল।

বললুম, 'তারপর?'

'তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না। তিনি স্থানটাও ঠিক ক'রে বলতে পারেননি—সর্দার এমন পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল যে বোঝা শক্ত। চেনা আরও কঠিন। সুতরাং সবাই তাঁর কথা গাঁজা বলেই উড়িয়ে দেয়। তিনি আর একবার গিয়ে ছবি আনবেন স্থির করেছিলেন, হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যান। সেই থেকে কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার বাবা মনে ক'রে রেখেছিলেন, মরবার কিছুদিন আগে আমাকে তিনি একদিন গল্প করেন। বাবা কথাটা খুব অবিশ্বাসও করেননি। তিনি বলেছিলেন যে, সে ভদ্রলোক মিছে কথা বানিয়ে বলবার লোক নন। আর তা যে নন, এই খবরেই তা প্রমাণ, এতকাল পরে সে কথাটা এমন করে উঠবে কেন? যাক্‌গে, আমার সময় বড় কম, চললুম।'

কথাটা ভাল ক'রে বুঝে তার সঙ্গে তর্ক করার কিংবা কোন বাধা দেবার আগেই সে এক লাফে বেরিয়ে চলে গেল।

এর পর তিন মাস অমিয়র কোন পাত্তা নেই। ওর বিধবা মা কেঁদে মরেন, কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়া হবে কিনা ওর কাকা চিন্তা করেন। আসাম পুলিশেও খবর দেওয়া হয়, কিন্তু তারা খুঁজে পায় না ওকে।

হঠাৎ তিন মাস পরে সে ঘুরে এল। ওর অমন সোনালী রং যেন কালি হয়ে গিয়েছে। আমাশা আর জ্বরে শীর্ণ—যেন ধুঁকছে একেবারে। প্রথমটা ওর সঙ্গে কোন কথাই কওয়া গেল না,

কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে একে একে সব গল্পটা শুনলাম। বিশ্বাস অবশ্য আজও করিনি কিন্তু গল্পটা শুনে আপনারা যদি কেউ এ সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করতে চান ত করতে পারেন। সেই জন্যই সেটা শোনাচ্ছি আপনাদের—

এখান থেকে গৌহাটি, সেখান থেকে অনেক খোঁজ-খবর করে ও নাগাদের দেশে পেঁছিয়। ওর অনেক অসুবিধা ছিল, যে কথাগুলো—অভিজ্ঞতা কম বলে—এখানে থাকতে ও ভেবে দেখেনি। প্রথমত টাকা ছিল না বেশি, দ্বিতীয়ত এর আগে কখনও আসামে যায়নি। ভৌগোলিক অবস্থাটা মোটে জানা নেই। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা, ওদের ভাষা জানে না। অমিয় যখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন তারা বোঝে না, আবার তারা যখন উত্তর দেয়—ওরও সেই অবস্থা। তবু খুঁজে খুঁজে উত্তর-পশ্চিম আসামের দুর্ভেদ্য পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে পেঁছিল। পথ দুর্গম, গাড়ি-ঘোড়া নেই। হাঁটা-পথে রাস্তা ভুল হয়, প্রশ্ন করবে কাকে? তাছাড়া পদে পদে বুনো হাতীর ভয়, ভাল্লুকের ভয়, সাপের ভয়। তার ওপর আছে নাগা আর কুকীরা। প্রথম প্রথম ওর হাফ-প্যান্ট দেখে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করত—সে এক জ্বালা! ওরা পুলিসের ওপর ভারি চটা—পুলিস ওদের বড় বিরক্ত করে। প্রত্যেক লোকালয়ে গিয়ে ওকে আগে প্রমাণ করতে হ'ত যে, ও পুলিসের লোক নয়—বেড়াতে এসেছে। সহজে তা প্রমাণ হ'ত না—এক একসময় ওদের বিষাক্ত তীর বা বল্লমে প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছে! যাত্রী বলে বোঝাতে পারলে তবে আতিথ্য নিতে পারত গ্রামে, নইলে থাকবে কোথায়?

সে আতিথ্যও খুব নিরাপদ নয় অবশ্য। এক গ্রামের সর্দার ওকে

একবার গ্রামের বাইরে পঞ্চায়েতি অতিথিশালায় থাকতে দিলে। ছিটেবাঁশের বেড়ায় মাটি-নিকানো, বেশ ঝক্‌ঝকে ঘরটি। একপাশে বাঁশেরই মাচায় চৌকি তৈরী করা, তাতে শুক্‌নো পাতার বিছানা। ফল মূল দুধ, সেবার ব্যবস্থাও মন্দ নয়— কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর খট্‌কা লাগল। প্রকাণ্ড ঘর, তিনটে দোরের খিলেনও রয়েছে কিন্তু তাতে কোন আগড় বা কপাট নেই। সর্দারকে প্রশ্ন করতে সে বেশ সহজকণ্ঠে শুনিয়ে গেল—কপাট ক'রে ত কোন লাভ নেই, বুনোহাতীর পাল যখন আসে, তখন দরজা বন্ধ দেখলেই ভেঙ্গে দিয়ে যায়। 'আচ্ছা আসি', বলে সে খুব স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে গেল। সামনেই পাহাড়ে-রাস্তা, ওপরে পাহাড়, নিচে খাদ। এরই মধ্যে যদি বুনোহাতীর পাল থাকে? তাছাড়া খোলা দরজা—বাঘ ভাল্লুক ত যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। শুকনো পাতা জ্বেলে আগুন করবে বেচারী, সে উপায়ও নেই, আগুন দেখলেই হয়ত হাতীর পাল এসে হাজির হবে। অমিয় বলে সেই একরাত্রির দুশ্চিন্তায় তার এক বছরের পরমায়ু চলে গিয়েছিল।

অমিয় সত্যি-সত্যি অনেকবারই মৃত্যুর দোর পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে এসেছে। একবার ওর চোখের সামনেই বুনো হাতী একটা মোটর গাড়ি উল্‌টে খাদে ফেলে দিলে। সে নিজেও তার সামনে পড়েছিল, অনেক কষ্টে একটা ঢালু জায়গায় গাছ ধরে ঝুলে প্রাণ বাঁচায়, আর একবার একটা বাঘের সামনে পড়ে। দূর থেকে একজন পাহাড়ী তীর মেরে ওকে রক্ষা করে।

তবু অমিয় হাল ছাড়েনি। বনের ফল-মূল খেয়ে আর এইভাবে চলে একসময় ও এমন একটা স্থানে পেঁাছল যেটা দক্ষিণ-

হিমালয়ের একটা দুর্ভেদ্য ও একেবারে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। সেটা আসাম সরকারের অধীন, কি ভূটানের কি তিব্বতের, তা বোধ হয় কোন দেশের সরকারই জানে না। কোন মানুষ তার আগে সেখানে এসেছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু সভ্য মানুষ যে যায়নি এটা ঠিক। কোন পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন কোথাও নেই, সূর্য দেখে দিক্ বুঝতে হয়। পথ নিজে নিজে ক'রে নিতে হয়। ওর সঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত এক নাগা গিয়েছিল, তারপর সেও হাল ছেড়ে পালিয়ে আসে।

কিন্তু জায়গাটায় পৌঁছে ওকে অনেকটা নেমে আসতে হয়েছিল এটা ঠিক, মানে পার্বত্য অঞ্চল ঠিকই, কিন্তু খুব উঁচু নয়। অর্থাৎ হিমালয়ের ও অঞ্চলটা যেন টোল খেয়ে দেবে গেছে! ফলে এখানটায় খুব শীত নয় কিন্তু কেমন একটা চাপা চাপা আবৃহাওয়া। সর্বদাই মেঘলা ভাব, নিবিড় ঘন লতাপাতা ও জঙ্গল ভেদ ক'রে সূর্যকিরণ সে অঞ্চলে কখনই পেঁছিয় না, চারিদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে দিনের আলো যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়, ওখানে আসে না। আর একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব, যেন সব সময় সেখানে বাষ্প জমে আছে খানিকটা!

অমিয় কিছুই জানত না, কিন্তু ঐ আবৃহাওয়াতে মনে হল সে যা দেখতে চায় তা এই স্থানেই মিলবে! কোথায় মিলবে, কোন্ দিকে তার যাওয়া উচিত, তা অবশ্য সে জানে না। সুতরাং শুধুই ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত। সঙ্গে খাবার নেই। সামান্য যা বিস্কুট ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। টর্চের ব্যাটারি নিবু নিবু, দেশলাই ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। এ অবস্থায় আর কদিন থাকতে পারে মানুষ? যা তা ফল খেয়ে আমাশা, রোজ জ্বর আসে! সঙ্গে অস্ত্র নেই, ভরসার

মধ্যে এক নাগার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া এক বর্শা। তাও কোন জন্তুর সামনে পড়লে হাতে থাকবে কিনা কে জানে?

অগত্যা ওকে ফিরতে হ'ল। কোনমতে তিনটে দিন সেই ভাবে কাটিয়ে হতাশ হয়ে ও ফিরছে—আন্দাজে আন্দাজে দক্ষিণ দিক হিসেব ক'রে ক'রে, এমন সময় এক অঘটন। নিবিড় জঙ্গলে আগাছা সরাতে সরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটা গাছের ডালে বসে বিশ্রাম করছে এবং পা থেকে এক মনে জোঁক ছাড়াচ্ছে, এমন সময় সহসা পেছনে যেন মানুষের কণ্ঠস্বর! চমকে চেঁচিয়ে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দেখলে যে, সত্যি সত্যিই মানুষ। চুলে দাড়িতে লোমে জট পাকিয়ে কতকটা বনমানুষের মত দেখতে হয়েছে তাকে, গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই, কোন মতে কতকগুলো শুকনো পাতায় লজ্জা নিবারণ করা হয়েছে মাত্র। চোখের দৃষ্টি উগ্র, গায়ের রং ফরসা, কিন্তু লোমে ও ময়লায় বোঝবার উপায় নেই, নখগুলো বড় হয়ে বেঁকে গেছে ক্রমশ।

ওকে ঐভাবে ভয় পেতে দেখে সে হাসল। এব্ড়ো খেব্ড়ো দাঁত, কিন্তু একটাও ভাঙ্গা নয়। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কে বেটা? এখানে কেন এসেছ, তুমি কি আংরেজের গোয়েন্দা?'

অমিয়রও হিন্দীজ্ঞান তথৈবচ। তার উপর ঠক্ ঠক্ ক'রে সে কাঁপছে তখন। তবু কোন মতে বুঝিয়ে দিলে—সে গোয়েন্দা নয়, সে বাঙ্গালী। অদ্ভুত একটা জন্তুর সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে।

সে লোকটির তবুও যেন সন্দেহ যায় না। বললে, 'সচ্? আচ্ছা! মহারাণী ভিক্টোরিয়া এখনও রাণী আছেন, না বাহাদুর

শাহের ফৌজ আবার দিল্লী দখল করেছে? খবর জানো কিছু?'

অমিয় ত হাঁ। লোকটা পাগল ত শেষ পর্যন্ত কিন্তু মার-ধোর না করে ওকে।

ওর মুখের ভাব দেখে সে দু-পা এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, 'কথা বুঝতে পারছ না?'

'আ—আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা ত কবেই মারা গেছে!'

'মরে গেছে? ঝুটি বাত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা গেছেন, তাঁর ছেলে গেছে, নাতি গেছে—এখন নাতির ছেলে রাজা। তা ছাড়া এখন আর ইংরেজদের রাজত্ব নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি।'

'তাই নাকি!' ওর যেন বিশ্বাসই হয় না। সে বললে, 'তা হ'লে কি আবার সিপাইরা লেগেছিল লড়াইতে?'

'উহুঁ, এবার সিপাইরা নয়। মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র আন্দোলনে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।'

'মহাত্মা গান্ধী? সে আবার কে?'

এতক্ষণে অমিয়র মনে হ'ল যে, কোথায় একটা গণ্ডগোল হচ্ছে! সে সংক্ষেপে মহাত্মা গান্ধীজীর পরিচয়টা দিলে। তখন লোকটি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে এটা কত সম্বৎ জানতে চাইলে। সম্বৎ কাকে বলে অমিয় জানে না—সে ইংরেজী সাল বললে। লোকটি আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনেছ?'

'শুনেছি! সে ত আঠারশ সাতান্ন সালের কথা। এখন থেকে প্রায় একানব্বই বছর আগেকার কথা!'

লোকটা বিহ্বল ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, ‘ঝুটু। আমি কে জানো? আমি নানা সাহেব। তাতিয়া টোপী আর আমি সিপাইদের চালিয়েছিলুম।’

এবার অমিয়র পালা। সে খানিকটা চুপ ক’রে থেকে ওরই মত গলার সুর ক’রে বললে, ‘ঝুট্‌! তুমি আসলে পাগল।’

এইবার লোকটা যেন জ্বলে উঠল একেবারে, চোখ রক্তবর্ণ ক’রে কী কতকগুলো হড়বড় ক’রে বকে গেল! সে যে কি ভাষা, তা অমিয় বুঝতে পারলে না। কিন্তু আমার মুখে মারাঠী বুলি শুনে বলেছিল পরে যে,— সে কতকটা এই রকমই বটে।

তারপর লোকটি হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর সেই থাবার মত নোংরা হাতে ওকে চেপে ধরে বললে, ‘আমি সূরযনারায়ণের দিব্যি করছি, গঙ্গামায়ির দিব্যি করছি, আমিই নানাসাহেব। বিশ্বাস করো! গণপতি ভগবানের দিব্যি করছি, আংরেজরা টোপীকে ফাঁসি দিয়েছে তা আমি জানি, তাই পালিয়ে এসেছি। ঠিক কতদিন এসেছি বলতে পারব না, তবে তুমি যতদিন বলছ অতদিন হয়নি নিশ্চয়ই, বড়জোর তিন কি চার বছর।’

অমিয় ত ভয়ে কাঠ! কোনমতে পাগলটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারলে বাঁচে! তবে সে জোর গলায় বললে, ‘আঠারশ সাতান্নতে সিপাই বিদ্রোহ হয়—এটা উনিশশো আটচল্লিশ। আমি তোমাকে ঠিকই বলছি। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার বাবা সে সময়ে মিরাটে ছিলেন।’

লোকটি খানিকটা বিহ্বল ভাবে ওর দিকে চেয়ে থেকে ওর হাত ছেড়ে দিলে। তারপর খানিকটা চোখ বুজে থেকে বলল, ‘আমি কি

সত্যিই পাগল হয়ে গেছি তাহ'লে ? এতদিন কেটে গেল, অথচ কিছুই টের পাইনি ? অবিশ্যি সময়ের হিসেব রাখা এখানে সম্ভব নয়, তা ব'লে এত তফাৎ !'

তারপর সহসা যেন একটা চমক ভেঙ্গে উঠে সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি দেখতে এখানে এসেছ বললে ?'

অমিয় ওকে সব বুঝিয়ে বললে, মানে যতটা বোঝানো সম্ভব। সব শুনে সে বললে, 'আচ্ছা ! সৃষ্টির আগে এই রকম সব জানোয়ার ছিল নাকি পৃথিবীতে ? আমরা এসব খবর কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি যে রকম জানোয়ার বলছ সে রকম কেন শুধু, আরও ঢের অদ্ভুত রকমের অতিকায় জন্তু আমি দেখেছি। প্রথমটা ভাবতুম ভূত, তারপর মনে করেছিলুম যে এদেরই আমাদের শাস্ত্রে দানব বলে। আবার এক রকমের বিরাট পাখী আছে গলাটা তাদের সাপের মত অথচ এধারে পাখা—বিরাট পাখা। সে স্থানটা কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর, আর যে বিশ্রী পাঁক—তরল পাঁকের সমুদ্র যেন ! আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি। ঐ একটা আঁশওয়ালা দৈত্যের মত গিরগিটি তাড়া করেছিল। ওখান থেকেই কোন-একটা হয়ত ছিটকে গিয়ে পড়েছে লোকালয়ে। তবে সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম, তুমি যেতে চাও ?'

অমিয়র অবশ্য যাবার মত অবস্থা ছিল না তবু সে বললে, 'আপনি পথ দেখাবেন ?'

মাথা নেড়ে নানাসাহেব বললে, 'না, সেখানে যেতে আমার সাহসে কুলোবে না, তোমারও গিয়ে কাজ নেই ; তুমি ফিরে যাও।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

খানিকটা পরে নানা সাহেব বললে, 'আমি একটা কথা কি ভাবছি জানো ?'

'কি ?' অমিয় প্রশ্ন করে।

'এখানটায় বোধহয় যেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে সময় হঠাৎ থেমে গেছে। কাল এগোয়নি, বয়স বাড়েনি—সেই সময়েরই একটা বছর থেকে সব থমকে গেছে। আমিও তার মধ্যে এসে পড়ে সেই বয়সেই থেকে গেছি—এর ভেতর যে একানব্বই বছর কেটে গেছে তা বুঝতেই পারিনি !···নইলে এমন হবে কেন ?'

লোকটা যে বদ্ধ পাগল সে সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল অমিয়র, তা কেটে গেল। সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে !

কোনমতে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক ! ঠিক !'

লোকটি বললে, 'তা তুমিও এখানে থেকে যাও না ! থাকবে ?'

অমিয় বললে, 'না, সে আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি ফিরে চলুন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাকে সকলে মাথায় ক'রে রাখবে ! হয়ত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি আপনিই হবেন !'

'তাই নাকি ? যাবো তোমার সঙ্গে ? আংরেজ নেই, ঠিক জান ? যদি ধরে ফাঁসী দেয় ?' তার চোখ যেন জ্বলতে লাগলো, আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে।

অমিয় কথাটা বলে ফেলে ফ্যাঁসাদে পড়ল। তবু মিছে কথা বলতে পারলে না। সে বললে, 'কোন ভয় নেই—আপনি নির্ভয়ে চলুন।'

লোকটি তখনই বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে, সেও বিশেষ পথ

চেনে না—তবুও অমিয়র সঙ্গে হাংড়ে হাংড়ে চলল এরই ভেতর একবার একটা প্রকাণ্ড কী পাখী বিশ্রী একটা গর্জন ক'রে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল! এত ভয় পেয়েছিল অমিয় যে ভাল ক'রে চাইতেই পারলে না সে অনেকক্ষণ, তবু ওর সন্দেহ হল সেটা টেরোড্যাক্‌টিল জাতীয় জীব।

নানাসাহেব এত কাল এদেশে থেকে খাদ্য-খাবারের খোঁজ রাখতেন—তিনি খুঁজে খুঁজে নানা রকমের ফল সংগ্রহ করে অমিয়কে দিলেন।

কিন্তু বেচারীর আর সভ্যতার মুখ দেখা হয়ে উঠল না। সেই স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা হিমালয়ের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা লোকালয়ের দিকে উঠে আসতেই বিচিত্র এক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ লোকটি যেন শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে বুড়ো হয়ে গেল—অসম্ভব রকমের! বোধহয় চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সে এমন পরিবর্তন যে অমিয় ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল! শেষে লোকটা যখন পথের ধারেই পড়ে মিনিট কতকের মধ্যে মারা গেল, তখন আর ওর জ্ঞান রইল না—ভয়ে দিশাহারা হয়ে পাগলের মত খানিকটা ছুটে গিয়ে এক গ্রামের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস্ নাগারা দেখতে পেয়েছিল ওকে! কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রে দুধ খাইয়ে তবে চাঙ্গা করে।

কিন্তু অমিয়র গল্পের সেইটাই শেষ নয়।

সে বলে যে সে যে-কদিন ঐ অঞ্চলে ঘুরেছে তার কোন

হিসাব পাচ্ছে না অর্থাৎ সব দিনগুলো ধরলে ওর তিন মাসের বেশী হয়—কিন্তু ঠিক ঐ-কটা দিনই কি ক'রে বাদ পড়ে গেছে !

বিকারের খেয়ালে কী দেখেছে হয়ত—কে জানে।

কিন্তু অমিয় তা স্বীকার করে না।

সামান্য কথানি রুটি

এই মাত্র কিছুদিন আগে—গত জুনমাসের মাঝামাঝি—খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চোখে পড়লো, বিহার-সরকার সিপাহী-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক কুঁয়ার সিংয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। স্থির হয়েছে—জগদীশপুরে ওঁর যে প্রাসাদ এবং প্রাসাদের সংলগ্ন আমবাগান প্রভৃতি—যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল একদা—আপাতত সেই সম্পত্তি সমস্তটাই বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে, যাতে সারা ভারতের লোক ঐ জগদীশপুরের সূত্রে চিরদিন কুঁয়ার সিংয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

সত্যিই—কুঁয়ার সিং, তাত্যা টোপী, ঝাঁন্সীর রাণী, আজিমুল্লা খাঁ—এঁরাই তো সেদিন যথার্থ নেতা ছিলেন! এঁদেরই চক্রান্তে, এঁদেরই সুচতুর ব্যবস্থায় একদিন ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠেছিল! নানা সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম দিকটা প্রকাশ্যে কোনো কাজ করতে পারেন নি—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দু-দিক বজায় রাখতে হয়েছিল তাঁকে। আর যারা এসেছিলেন—তাঁদেরও টেনে আনতে হয়েছিল!…জালে জড়াতে হয়েছিল সুকৌশলে। সে জাল বিস্তার করেছিলেন এঁরা, আর এঁদের বিশ্বস্ত দু-একজন সঙ্গী।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত আহ্বান গিয়েছিল এঁদের! পাঞ্জাব আর রাজপুতানা বাদে সারা উত্তর-

ভারত সেদিন উত্তর দিয়েছিল সে আহ্বানে। সমিধ্ বোধহয় প্রস্তুতই ছিল, বারুদের স্তূপ ছিল তৈরী—শুধু আগুনের ফুল্‌কি গিয়ে পড়বার অপেক্ষা। কিন্তু সে আগুনের ফুল্‌কিও বড় অদ্ভুত। যে আহ্বান গিয়েছিল এই বিশাল অর্দ্ধ মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে—তার লিপি বড় বিচিত্র! গ্রাম থেকে গ্রামে—শহর থেকে শহরে—কী এমন লিপি গিয়েছিল যা পড়তে যে-কোনো ভাষাভাষী, এমন কি সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকেরও কোনো অসুবিধা হয়নি?

সামান্য ক'খানি রুটি বা চাপাটি!

এ-গ্রামের একজন দু-খানি রুটি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ও-গ্রামে। যার হাতে দেওয়া হলো সে কী দেখলে সে রুটির মধ্যে কে জানে—নিশীথরাতের অন্ধকারে চুপি চুপি ছড়িয়ে দিয়ে এলো সে বার্তা – আবার হয়তো পরের দিন সকলেই ক'খানি রুটি চ'লে গেল আশে-পাশের সমস্ত গ্রামে। পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল ফেললে যেমন তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, তেমনি ভাবে দেখতে দেখতে অল্প ক-দিনের মধ্যে খবর চলে গেল বন-মাঠ ডিঙিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল!···এসেছে আদেশ, বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হলো শেষ!'

প্রায় একশো বছর আগের কথা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের, একেবারে শেষের দিক। পৌষ মাসের শীত উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে যেন টুঁটি টিপে ধরেছে সবাইকার।

বিহারের আরা শহর—বিখ্যাত। আজও বিখ্যাত। হাওড়া

থেকে বেরিয়ে ইস্টার্ণ রেলপথের যে প্রধান লাইনটা পাটনা হয়ে এলাহাবাদের দিকে এগিয়ে গেছে, তার ওপরই পড়ে 'আরা' স্টেশন। আর তার কাছে 'জগদীশপুর' গ্রাম।···বৃদ্ধ জমিদার কুঁয়ার সিংয়ের জমিদারী। সেদিন ঐ জগদীশপুরেরই রাজবাড়ীর একান্তে একটা বড় ঘরে মন্ত্রণা-সভা বসেছিল, সন্ধ্যার কিছু পরে। আধো-অন্ধকার ঘর। বাইরের দিকে কোনো জানলা নেই—বিহারের কোনো বাড়ীতেই তখন জানালা থাকতো না। ভেতরের দিকের একমাত্র দরজাও শীতের ভয়ে বন্ধ। অবশ্য ঝাড়ের অভাব নেই ঘরে, কিন্তু তাতেও তো রেড়ির তেলের বাতি তাছাড়া ইচ্ছে ক'রেই বোধহয়—ঝাড়ের সব আলোগুলো জ্বালা হয়নি।

দামী ফরাস পাতা ঘরে। তামাকের ব্যবস্থাও ঢালা। হিন্দু ও মুসলমান হুঁকাবরদাররা ঘন-ঘন কল্‌কে পাল্‌টে দিয়ে যাচ্ছে। সামনে থালায় পান আর সুপারি-এলাচ। কিমামও আছে। সুগন্ধি তামাক আর পান-মশলার গন্ধে ঘর মৌ-মৌ করছে। তামাক আর রেড়ির-তেলের ধোঁয়ায় ঘরের অধিবাসীদের মুখগুলো আব্‌ছা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথা চলছে ফিস্‌-ফিস্ ক'রে। ষড়যন্ত্রের আভাস সকলকার ভাব-ভঙ্গীতেই।

বহুরাত্রি পর্যন্ত চললো বৈঠক। নিশ্বাস আর ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে সকলের মনও। তারই মধ্যে অকস্মাৎ প্রবীণ কুঁয়ার সিং উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন একবার—'ভাই সব, মিছিমিছি তোমরা ভাবছো। সব তৈরী আছে—আগুন জ্বাল্‌লেই দেখবে যে, বারুদের স্তূপ জমে আছে সামনে। শুধু এখন—আমরাও যে তৈরী, এই খবরটা দেশের ভেতর পৌঁছে

দিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমরা প্রস্তুত থাকো।... কোথাও আগুন জ্বলেছে এই খবরটা পেলেই যাতে তোমরাও জ্বালাতে পারো তোমাদের আগুন!'

উত্তেজনায় গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কুঁয়ার সিং। আবার হাঁপাতে-হাঁপাতে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন ফেলে-দেওয়া সেই নলটা।

আজিমুল্লা খাঁ সামনেই ব'সে-বসে তামাক খাচ্ছিলেন। এখন সট্‌কাটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু হাসলেন ঃ

'কিন্তু খবরটা পাঠাবেন কী ক'রে রাজাসাহেব! গ্রামে-গ্রামে ছড়াবার বহু আগেই ঐ সয়তান আংরেজগুলো জেনে যাবে যে!'

কুঁয়ার সিং বললেন, 'সাংকেতিক-লিপি ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু সাংকেতিক-লিপি বোঝাবার জন্য আবার লোক চাই যে। গাঁয়ের লোকে বুঝবে কি ক'রে?'

'মুখে-মুখেই খবর পাঠাতে হবে।'

'এত লোক পাওয়া যাবে কি ক'রে?'

'তাহ'লে এমন একটা কিছু সংকেত ব্যবহার করতে হবে, যা এমনি কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু তার ইঙ্গিতটা সবাই বুঝবে!'

'কিন্তু এমন কী জিনিস আছে যা সবচেয়ে সাধারণ, অথচ সবচেয়ে নিরাপদ—যার ইঙ্গিত সবাই বুঝবে?' প্রশ্ন করলেন ফৈজাবাদের বিখ্যাত নেতা মৌলভী আহ্‌মদউল্লা।

ও-পাশের আবছা-অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠলো—'চাপাটি।'

'চাপাটি!' বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালেন আজিমুল্লা খাঁ।

'কে, কে ওখানে কথা কইলে ?'

ধোঁয়ার মধ্যে চোখ মেলে ভালো ক'রে তাকাবার চেষ্টা করলেন কুঁয়ার সিং। কেমন একটা অস্পষ্ট সংশয়ের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।...কে ও লোক ? কোথা থেকে এলো ? পরিচিত কেউ তো নয়। গুপ্তচর নয় তো শত্রুর ?

'আজ্ঞে, আমি।'

যে ওপাশ থেকে কথা বলেছিল সে এবার এগিয়ে এলো। দীর্ঘ-দেহ গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ একজন। খাটো বেনিয়ান-কোর্তার মধ্য দিয়ে শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাচ্ছে। কাঁধে একটি গামছা উত্তরীয়ের মত ফেলা, তার একপ্রান্তে কী-একটা বাঁধা। ললাটে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা তার ওপর বিভূতি-লেপা—একদিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত। বিপুল শিখা কাঁধ পর্যন্ত লতিয়ে এসেছে। তার ডগায় একটি ধুতরোর ফুল বাঁধা।

একবারে সামনে এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়ালেন তিনি।

'কে, কে আপনি ? এর ভেতর কেমন ক'রে এলেন ?'

'আমি ব্রাহ্মণ—এ-ই আমার পরিচয় জেনে রাখুন। এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না। আপনারা যা সন্দেহ করছেন তা নয়—আমি শত্রুর গুপ্তচর নই। তাছাড়া, গুপ্তচর তারা পাঠাবে কেন ? এ তারা কোনদিন স্বপ্নেও দেখবে না যে, তাদের উচ্ছেদের জন্য এতগুলি প্রতাপশালী লোক ষড়যন্ত্র করছেন ! তারা নিশ্চিন্ত আছে।...তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো—আমি ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবপূজা ক'রে জলগ্রহণ করি, নিত্য যজ্ঞ করি, এই যজ্ঞ-বিভূতি আমার ললাটে, শিবের প্রসাদী-

ফুল আমার শিখায়, আর হাতে এই উপবীত, আমি শপথ ক'রে বলছি—আমি মনে-প্রাণে আপনাদের দিকেই। এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত। সেই উদ্দেশ্যে নিজের গরজে খুঁজে-খুঁজে এখানে এসেছি। এই একাগ্রতা ও আমার তপস্যা বলেই আপনাদের সতর্ক প্রহরীদের এড়িয়ে অনায়াসে এই মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে পেরেছি। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন।'

তিনি তাঁর যজ্ঞোপবীত হাতে জড়িয়েই হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

এ শপথ যে হিন্দুর কাছে কতখানি ছিল, তা সেকালে মুসলমানরাও জানতেন আর তাঁরা বিশ্বাসও করতেন। তাই আহ্‌মেদ-উল্লা তাড়াতাড়ি বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনি স্থির হোন। ' আপনাকে আমরা বিশ্বাস করছি।'

ব্রাহ্মণ বসলেন।

কুঁয়ার সিং বললেন, 'তারপর? আপনি চাপাটির কথা কি বলছিলেন?'

'কিছুই না। ধরুন, গ্রাম থেকে গ্রামে যদি কেউ দু-খানা ক'রে রুটি পৌঁছে দেয়? কে কি ভাববে? কে কি বুঝবে? অথচ এমনি ক'রে আমাদের আহ্বান অব্যর্থ ভাবে পৌঁছোবে লোকের কানে—সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

'কিন্তু ঠাকুর—' আজিমুল্লা একটু কৌতুকের ভঙ্গীতেই বললেন, 'কিন্তু ঠাকুর – আংরেজ যেমন বুঝবে না, তেমনি দেশের লোকও তো বুঝবে না। তারা অবাক হয়ে ভাববে, এ আবার কি? এর মানে কি?'

'তাছাড়া'·· অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদার ঠাকুর সিং বললেন, 'তাছাড়া, মুসলমানের রুটি—হিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য, ছোটজাতের রুটি ব্রাহ্মণ ছোঁবে না রুটি পাঠানোর বিপদও আছে। কেউ-কেউ হয়তো এটাকে অপমান বলেই মনে করবেন।'

'না।' ব্রাহ্মণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'সে ভয় নেই। খাঁ সাহেব, আপনার কথা ঠিকই—ঠাকুর সিংজীও কিছু অন্যায় বলেন নি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সে-কথাও আমি ভেবেছি বৈ কি!'

তারপর একটু থেমে, কেমন একরকম চাপা-গলায় বললেন, 'আমার এই তপস্যা, এই সাধনা আজ থেকে শুরু হয়নি—হয়েছে ঠিক দু-বছর আগে থেকে। গাজিমুল্লা খাঁ—আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আজ ভারতের এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে এই খবর পৌঁছোয়নি যে—ইংরেজদের এখান থেকে তাড়াবার জন্য একটা বিপুল আয়োজন চলছে। সময় যখন কাছে এগিয়ে আসবে, তখন তোমাদের গ্রামে কোথাও থেকে এসে পৌঁছোবে দু-খানি রুটি। সেই চিহ্নই হচ্ছে সাংকেতিক-লিপি—যুদ্ধের আহ্বান। সেই রুটি পেলেই তোমাদের গ্রামের লোকেরা চারিদিকের অন্যান্য গ্রামে আবার সেই রুটি পেঁছে দেবে—আর প্রস্তুত হবে যার যতটুকু সাধ্য নিয়ে।'

সকলে স্তম্ভিত—কারুর মুখে কোনো কথা নেই। এই সবচেয়ে শক্ত কাজটিই তা'হলে হয়ে গেছে? কিন্তু কী ক'রে হলো? কে করলে?

সকলের মনের প্রশ্ন মুখে ফুটে করলেন, কুঁয়ার সিং: 'কিন্তু এ কে করলে? কারা করলে?'

'কারা নয় সিংজী। বলুন, কে। পাঁচ কান হ'লে আর কোনো কথা গোপন থাকে না। আমিই করেছি এই কাজ অসম্ভব সম্ভব করেছি। আমি একা সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি এই দু-বছর ধরে। গাছলতায় ঘুমিয়েছি, ভিক্ষান্ন নিবেদন ক'রে দিয়েছি ইষ্টদেবতাকে, ঝড় জল হিম রৌদ্র কিছু গ্রাহ্য করিনি। কারণ, এ যে আমার তপস্যা। হ্যাঁ—দু-এক জায়গায় আমার মত দু-একজনকে পেয়েছি বৈকি, যারা আমারই মত ইংরেজকে ঘৃণা করে। তারাও আমার কাজের ভার কিছু-কিছু তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে—নইলে কি কাজ শেষ হতো এর ভেতর ?'

'কিন্তু এ-কথা আপনার মনে গেল কি ক'রে ?' কে যেন প্রশ্ন করলেন।

'লর্ড ডালহাউসি যা করছেন, তা থেকে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে আর বেশী দেরি নেই—এ-কথা কে না জানে মৌলভী জী ? আমি শুধু তার অগ্রদূত হয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়েছি মাত্র।'

'আপনার কি স্বার্থ—জানতে পারি কি ?'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন ব্রাহ্মণ। তারপর গামছাটি টেনে কোলে নামিয়ে, খুললেন তাঁর সেই কোণে-বাঁধা পুঁটুলিটি। তা থেকে কী দুটো বস্তু নিয়ে ফেলে দিলেন সকলের সামনে। সকলে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, একখানি বহুদিনের শুক্নো, প্রায়-গুঁড়িয়ে-যাওয়া বিবর্ণ রুটি, আর একটি শুষ্ক অরবিন্দ, অর্থাৎ শুক্নো পদ্মফুল।

সকলে চেয়েই আছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

ব্রাহ্মণ নীচুগলায়, গাঢ়স্বরে বললেন, 'দু-বছর আগে চলেছিলাম চন্দ্রনাথ—প্রভুজীকে দর্শন করবো ব'লে। মানসিক ছিল যে, ভিক্ষা

করবো না, সঙ্গেও কিছু নেবো না—যদি কেউ ডেকে কিছু দেয় তো খাবো, নইলে খাবো না। বাড়ী আমার গোরখপুর—সেখান থেকে বেরিয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম নির্বিঘ্নেই। কিন্তু মুঙ্গেরে গিয়েই এই আগুন জ্বললো—'

বলতে-বলতে থেমে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ব'সে রইলেন। বোধহয় বলতে কষ্টই হচ্ছিলো—সেদিনের সে কাহিনী। একটু পরে সামলে নিয়ে আবার বললেন, 'দু-দিন ভাগ্যে কিছু জোটেনি—তিন-দিনের দিন চারটি আটা দিয়েছিল এক দোকানদার—কিছু জ্বালানি কাঠও। গঙ্গাতীরে এক গাছতলায় ব'সে রুটি তৈরী ক'রে ইষ্টদেবকে নিবেদন করতে যাবো—এমন সময় এক বিঘ্ন। ওধার থেকে ঘোড়ায় চেপে এক সাহেব আর মেম আসছিলেন—সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড এক কুকুর। কুকুরটা আমাকে দেখতে পেয়েই অকস্মাৎ লাফাতে-লাফাতে আমার দিকে তেড়ে এলো। আমি প্রমাদ গণলাম। সামনেই পাতাতে রুটিগুলো সাজানো পথে পেয়েছিলাম একটা পদ্মফুল—সেই ফুল আর লোটার গঙ্গাজল নিয়ে সবে তখন ইষ্টকে স্মরণ করেছি—ঐ ফুল আর জল দিয়ে রুটিগুলো তাঁকে নিবেদন করবো—হায়! শুধু যদি সেটাও পারতাম! নিজের ক্ষুধার জন্য ভাবি না—কিন্তু দেবতাও যে দু-দিন অনাহারে!…আমি সাহেবের দিকে হাত-জোড় ক'রে চেঁচিয়ে বললাম—সাহেব, ফেরাও, ফেরাও—কুকুরকে সামলাও! কিন্তু সাহেব আর মেম হি-হি ক'রে হাসতে লাগলো আমার কাতর প্রার্থনায়। দেখতে-দেখতে কুকুরটা এসে মুখ দিল রুটিতে…একটা পায়ে ক'রে পদ্মফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, দেবতার পায়ে-দেবার ফুল—কুকুরের পায়ে লাগলো!'

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ব্রাহ্মণের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো, চোখের কোলে-কোলে ভ'রে এলো জল। একটু থেমে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'এতখানি রাগ সাম্‌লাতে পারলাম না। যে-তিনটে পাথর দিয়ে উনুনের মত করেছিলাম, তারই একটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম কুকুরটাকে সজোরে। একবার আওয়াজ ক'রে উঠেই কুকুরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।...সাহেবের পেয়ারের কুকুর—ঐ অবস্থা দেখেই সাহেব ছুটে এসে হাতের চাবুকের বাড়ি এলোপাতাড়ি মারতে লাগলেন আমাকে। বুটসুদ্ধ লাথি মারলেন সজোরে...মুখ কেটে চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। এখনও সে দাগ আছে। তারপর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েই হোক—কিংবা কুকুরটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বেশি দরকার বলেই হোক, একসময় সাহেব থামলেন, ঘোড়া থেকে নেমে কুকুরটাকে কোলে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন, আমি সেই রক্তাক্ত দেহে অশুচি রুটিগুলোর মধ্যে প'ড়ে রইলাম!'

'আর কেউ ছিল না সেখানে?' সক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলেন কুঁয়ার সিং, 'মানুষ ছিল না কেউ সেখানে?'

'ছিল, ভিড়ও হয়েছিল, কিন্তু সাহেব দেখে কেউই এগোয়নি, বরং দু-একজন এসে আমাকেই দোষ দিলে! সিংজী! খাঁ সাহেব! এ-ই সেই রুটি, আর এ-ই সেই পদ্ম। সেদিন সন্ধ্যায় গায়ের জ্বালা জুড়োতে গঙ্গায় নেমে শপথ করেছিলাম যে, এই দুটি জিনিস দিয়েই আমি এর শোধ নেবো। এমন আগুন জ্বালবো এই সামান্য দুটি তুচ্ছ জিনিস দিয়ে—যে-আগুন নিভোতে লাগবে হাজার-হাজার ইংরেজের রক্ত।...তারপর সেইদিন থেকে আর বাড়ী ফিরিনি। জানতাম যে,

বড়লাট ডালহাউসী যা কাণ্ড-কারখানা করছেন তাতে আগুন জ্বলবেই —তাই বেরিয়ে পড়লাম শুধু সেই খবরের জন্য প্রস্তুত রাখতে দেশকে। সাধুর ছদ্মবেশে ঐ রুটির কথাই ব'লে বেড়িয়েছি এতদিন। আর-একটা কথা—ব্যারাকে-ব্যারাকে যখন খবর দেবেন—একটি ক'রে পদ্ম পাঠাবেন! সে-ব্যবস্থাও আমি ক'রে এসেছি।'

কুঁয়ার সিং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন. 'ব্রাহ্মণ, আপনি একা যা করেছেন, আমরা হাজার লোক লাগিয়েও তা করতে পারতাম না। আপনি আমাদের মহৎ উপকার করেছেন।...আপনি ক্লান্ত, যদি দয়া ক'রে ক-টা দিন এ-গরীবের আতিথ্য গ্রহণ করেন তো বাধিত হই।'

'ধন্যবাদ সিংজী।' ব্রাহ্মণও উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমার কাজ এখনও কিছু বাকি আছে।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। নিঃশব্দে সেই নিশীথ-অন্ধকারে যেন ছায়ার মতই নিমেষে মিলিয়ে গেলেন।

সেই ব্রাহ্মণ তিন দিনের পথ হেঁটে এসে গঙ্গাতীরে পৌঁছোলেন। তাঁর গামছায় তখনও বাঁধা আছে সেই রুটি আর পদ্ম। ও-দুটি বস্তু আসবার সময় কুড়িয়ে আনতে তাঁর ভুল হয়নি।

গঙ্গার তীরে পেঁৗছে সেই চাপাটি আর পদ্ম আগে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন, তারপর স্নান ক'রে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েই পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন। আর করলেন—ইষ্টপূজা। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত উনি ইষ্টপূজা করেন নি। আজ প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে, নিশ্চিন্ত হয়ে

পূজা করলেন। তারপর আস্তে-আস্তে গঙ্গার জলেই আরও নেমে গেলেন—আর উঠলেন না। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে।*

* ইতিহাসে আছে, চাপাটি আর পদ্ম পাঠিয়ে সিপাহী-বিদ্রোহের আসন্ন আভাস জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেন এই দুটি বস্তুই পাঠানো হয়েছিল, আর কে তাদের ব'লে দিয়েছিল এই সাংকেতিক জিনিস দুটির অর্থ, সে-সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানেই কল্পনার খেলা।

তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসী

গল্পটা আমি শুনেছিলুম মদন মুখুয্যের কাছে। মদন মুখুয্যে কাশীতে আমাদের বাড়ীর দোতলায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর তখন বাহাত্তর বছর বয়স, বছর পনেরো আগে পেন্‌সন নিয়ে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। মদন জ্যাঠামশাই এ গল্প আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবার মুখে, তাঁর বাবা মিউটিনীর সময় মাউতে চাকরী করতেন নাকি। কাজেই, এ গল্পের সত্যি-মিথ্যে ঠিক ক'রে বলা আজ শক্ত। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একশ বছর আগে—যাঁরা বলেছেন, তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আজ।

যাই হোক্—তবু গল্পটা বলছি এই জন্যে যে মোটামুটি এটা গল্পের মতই। গল্প হিসেবেই শোনা যাক্ না!

মদন জ্যাঠামশাইয়ের বাবা প্রজাপতি মুখুয্যে মাউতে কাজ করতেন তা আগেই বলেছি; কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি এই যে, মাউতে তিনি এসেছিলেন পরে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যখন ডিসেম্বর মাসে কানপুর দখল করেন তখন তাঁরই হুকুমে একদল কমিসারিয়েট কর্মচারী কানপুর থেকে মাউতে আসেন, সার হিউ রোজ সেখানে যে ঘাঁটি বসিয়েছিলেন—তার কাজ চালাবার জন্য। কাজেই বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ড যখন হয় তখনও প্রজাপতি কানপুরে আছেন।

কানপুর গ্যারিসনকে নিরাপদে নৌকো করে এলাহাবাদে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নানা সাহেব পরে তা রাখতে পারেননি, পাড়

থেকে গোলা ছুঁড়ে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল - এজন্য সকলেই সিপাইদের, বিশেষ ক'রে নানা সাহেব ও তাত্যা টোপীকে দোষ দেয়। কিন্তু প্রজাপতি বলতেন যে, ওঁদের কোন দোষ ছিল না। ওঁরা সরল ভাবেই হুইলার সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই দিনই এলাহাবাদ থেকে খবর এসে পৌঁছল যে কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহী সিপাইদের দমন করবার পর ইংরাজরা সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা অকথ্য। কোন মানুষ যে কোন মানুষের ওপর সেরকম অত্যাচার করতে পারে, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত—কানে শুনলে ত হয়ই না। তবু, একের পর এক লোক যখন বলতে লাগল যে, তারা চোখে দেখেই এসেছে, নিরীহ গ্রামবাসী বা শহরবাসীদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার হয়েছে—বৃদ্ধ বালক স্ত্রীলোক কেউ বাদ যায়নি, তখন সিপাইরা সব ক্ষেপে উঠল প্রতিশোধের জন্য। যারা এ কাজ করছে তাদেরই ভাইবেরাদাররা নিরাপদে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে? কখনও না। নানা সাহেব ও তাত্যা টোপী অনেক বোঝালেন, বললেন যে তাঁরা ওদের কথা দিয়েছেন সিপাইদের সেনাপতি হিসাবেই—কথার খেলাপ হ'লে বড় অন্যায় হবে ইত্যাদি। তাতে কিছুক্ষণের মত শান্ত হলো সবাই কিন্তু তাঁতিয়া বুঝলেন এ বাহ্য শান্তি, এর ভিদ মোটেই শক্ত নয়।

তবু তখন আর সময় নেই। নৌকো প্রস্তুত, সাহেবরা উঠছে। মেয়েদের ও শিশুদেরও নিয়ে যেতে চায় ওরা। তাঁতিয়া টোপী হঠাৎ বললেন, 'মেয়েরা থাক্।'

হুইলার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

তাত্যা বললেন, 'কী জানি, আমি ভাল বুঝছি না। এদের মন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে—কি ক'রে বসবে তা কে জানে? ওঁরা থাকুন, আমি বন্দী ক'রে রাখার নাম ক'রে আটকে রাখছি। সুযোগ বুঝে আমি নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবো।'

হুইলার আর কি বলবেন! বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন যে ওদের—'

সে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাত্যা বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ আমার কোন হাত থাকবে, স্ত্রীলোক আর শিশুর ওপর কোন অত্যাচার হবে না।'

তাঁতিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক নবাবের খালি বাড়ীতে মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন; সিপাইদের বলে দিলেন, 'খুব কড়া নজর রাখবে—খবরদার, কোন মতে না কেউ পালায়।'

তিনি জানতেন যে ঐ ভাবে না বললে সিপাইদের হাত থেকে ওঁদের বাঁচানো শক্ত হবে। সেই থেকে ঐ প্রাসাদটির নাম হয়ে গেল বিবিগড়, যেখানে বিবিরা থাকেন।

এবার সাহেবরা সবাই প্রায় নৌকোয় উঠেছে, কতকগুলো ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় গেছে, কতকগুলো ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় আবার নতুন খবর নিয়ে একদল লোক এল এলাহাবাদের দিক্ থেকে—'জানো, এই কুত্তারা কাশীতে কি করেছে? শিশুদের কেটেছে মার চোখের সামনে, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর মুণ্ডু নিয়ে বল খেলেছে—যারা কোনও অপকার করেনি, যারা এ লড়াইয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাদের ওপর এই অত্যাচার! আর তোমরা এই শূয়োরদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছ?'

ব্যস্ ! সত্যি-মিথ্যে বিচার করার তখন সময় নেই, অগ্র-পশ্চাৎ কে ভাব্বে ? চোখের সামনে তখন খুন জেগেছে ওদের ! নানা ও তাত্যার ক্ষীণ চেষ্টা সে প্রবল বন্যায় কোথায় ভেসে গেল !

মাত্র চারজন না পাঁচজন ইংরেজ প্রাণ নিয়ে সেদিন পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দেখা গেল তাত্যার অনুমানই ঠিক ! কিছুক্ষণ পূর্বের শান্তিটা ছিল বাহ্য।

এরপর কিছুদিন না রইল তাত্যার তিলমাত্র অবসর, আর না রইল নানা সাহেবের। আগুন জ্বলেছে কিন্তু অনুকূল বাতাস নেই। সবাই ইংরেজদের দিকে। রাজপুতরা, শিখরা, গুর্খারা, এমন কি মারাঠা-রাজারাও ইংরেজদের সাহায্য করেছেন। জনসাধারণ প্রাণহীন, তাদের যেন কিছুই এসে-যায় না, কে হারল আর কে জিতল সে-খোঁজে ! এই দারুণ প্রতিকূলতা ও নিস্পৃহতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওঁদের দিনরাত। যাদের জন্য এবং যাদের নিয়ে এ কাজ করছেন তারাও এর গুরুত্ব বোঝে না ! এমন এক এক হঠকারিতা ক'রে বসে যে, সাধারণ লোকের বিরূপতা আরও বেড়ে যায়। এই বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে।

এই ভাবে তাত্যা ক্রমশঃ চারিদিক থেকে এমন বিব্রত হয়ে উঠলেন যে বিবিগড়ের বন্দিনীদের কথা তাঁর মনেই রইল না। কিন্তু যাদের ওপর ভার ছিল ওঁদের পাহারা দেওয়ার, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে গৌরব অর্জনের নানা পথ খোলা, নিজেদের কর্তৃত্ব করবার অসংখ্য উপায় চারিদিকে—আর তারা কতকগুলো

মেয়েছেলেকে পাহারা দিয়ে এখানে বসে থাক্‌বে? বিশেষতঃ যারা ওদের চিরশত্রু? তাছাড়া খাদ্য-খাবারের যে রকম টান, অতগুলো মেম-সাহেবকে বসিয়ে খাইয়ে লাভ কি?

জমাদার ইন্দ্রপাল সিং রোজ হাঁটাহাঁটি করে, 'গুরুজী, হুকুম দিন, ওদের শেষ ক'রে দিই। আর কতদিন এমন ক'রে আমরা বসে থাকব?'

তাত্যা ওদের বিরুদ্ধ-মনোভাব বুঝে কেবলই দিন পেছিয়ে দেন, 'সময় হলেই বলব ইন্দর পাল—আর দুদিন সবুর করো।'

অবশ্য অবসর এর ভেতর মেলেনি তা নয়—কিন্তু তাত্যারও ত সহস্র ঝঞ্ঝাট।

এমনি করে হঠাৎ একদিন ১৪ই জুলাই সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রপাল আবার এলো। তাত্যা তখন নানা ধুন্ধুপন্থ এবং আরও অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে গুরুতর মন্ত্রণা করেছেন। চারিদিকে বিপদ আসন্ন—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে চারিদিক থেকে যে সব সাহায্য তাঁরা পাবেন ভেবেছিলেন, তার একটাও পাচ্ছেন না, বরং ইংরেজরাই একটু একটু করে শক্তিসঞ্চয় করছে। দুশ্চিন্তার শেষ নেই, কোনদিকে পথ দেখতে পাচ্ছেন না—এমন সময়ে ইন্দর পালের সেই এক ঘেয়ে কথা 'কা করব বলুন গুরুজী!'

তাঁতিয়া বিরক্ত হয়ে বললে, 'দোহাই তোমার ইন্দর পাল, আমাদের একটু রেহাই দাও—'

'কথা একটা বলেই দিন না গুরুজী!'

'যা খুশী করো। শুধু আমাকে আর বিরক্ত করো না।'

তারপর সে কথা ভুলেই গেলেন তাত্যা। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার

সময়ই ভয়াবহ খবর এসে পৌঁছল—স্ত্রীলোক শিশু বিবিগড়ের প্রায় কেউই বাঁচেনি। সবাইকে হত্যা ক'রে ইন্দ্রপালের লোক এক বিরাট কুয়ার মধ্যে ফেলেছে—শুধু মৃতদেহে সে কুয়া ভর্তি হয়ে গেছে।

তখনই তিনি বিবিগড়ে ছুটলেন। সত্যিই ভয়াবহ। ভয়াবহ শুধু নয়—পৈশাচিক সে হত্যালীলা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ঊর্দ্ধ-আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু জানতেন যে ক্ষমা নয়—বিচারই আসবে সেখান থেকে। তিনি সিপাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমাদের জয়ের কোন আশা রইল না—এই পাপেই ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়ে গেল।'

প্রজাপতি বলতেন, এর পর থেকে তাত্যার মনে একতিলও আর শান্তি রইল না। কাজ করেন, যুদ্ধ করেন, মন্ত্রণা দেন—সবই কলের পুতুলের মত! কী একটা যেন অন্যমনস্ক ভাব! সর্বদাই যেন কি চিন্তা করেন! বাইরের দিকে কিসের শব্দে যেন কান পেতে থাকেন!

এক একটা পরাজয় হয় আর তাত্যার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে। সূক্ষ্ম, কুটিল সে হাসি—কেউ সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। বেতোয়ার যুদ্ধ গেল, মোরারের যুদ্ধ গেল, কোটার যুদ্ধ গেল—সর্বত্রই ঐ এক হাসি!

লক্ষ্মীবাই অনুযোগ করেন, ধুন্ধুপন্থ অনুযোগ করেন, আজিমুল্লা অনুযোগ করেন—'যুদ্ধে তোমার মন নেই গুরুজী, এ কি ছেলেখেলা করছ?'

তাত্যা হেসে বলেন, 'যুদ্ধে আমার সত্যিই মন নেই। আমি যে পরাজয়ের দিকেই কান পেতে আছি। এ শুধু কর্তব্য পালন করা বৈ ত নয়! ফল যে কী হবে তা ত জানিই।'

তারপর সে পরাজয় সত্যিই হলো—চারিদিক থেকে, সর্বতোভাবে! লক্ষ্মীবাই মারা গেলেন, নানাসাহেব পলাতক, কুন্‌ওয়ার সিং নিহত, রাও সাহেব ধরা পড়েছেন—বন্ধু বলতে, সহকর্মী বলতে কেউ নেই। সারা ভারত আবার ইংরেজদের হাতে। তবু তাত্যা মাতৃভূমির নামে শপথ করেছেন, দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে তিনি চেষ্টা ছাড়বেন না। তাই আশা কিছু না থাকলেও বাইরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, এক জমিদারের কাছ থেকে আর এক জমিদারের কাছে। তারা সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজী বলে—তাই ধরিয়ে দেয় না, কিন্তু সাহায্য? আর না। তাদের ঢের শিক্ষা হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে আর নয়।

তবু তাঁতিয়া ভেঙ্গে পড়েন না। সে শিক্ষা তাঁর নেই। তিনি জানেন, একটি লোক যদি সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে থাকে ত তাই যথেষ্ট, যে আগুন নিভেছে সে আগুনই আবার জ্বালিয়ে তুলতে পারবে নিজের প্রাণের বহ্নিতে।

কিন্তু এবারে এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেন না। যে বিবিগড়কে প্রায় ভুলে এসেছিলেন এতদিনে, সেই সেই বিবিগড়ই আবার নতুন করে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। রাত্রে ঘুমুলেই স্বপ্ন দেখেন সেই বীভৎস দৃশ্য—এমন কি সকালে জাগ্রত অবস্থাতেও, পূজা করবার সময় ধ্যানে বসলে নিজের ইষ্টদেবতার

মূর্তির বদলে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বিবিগড়ের সেই বিকৃত শবদেহগুলি !

তাঁতিয়া বুঝলেন—তাঁর সময় হয়েছে। আর নয়।

কী করবেন ? আত্মহত্যা ? যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন ?

না, তাতে ত তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ইংরেজদের হাতেই তাঁকে শাস্তি নিতে হবে যে !

এই ভাবতে ভাবতেই একদিন গিয়ে উঠলেন সিন্ধিয়ার সামন্ত মানসিংহের কাছে। মানসিংহ বললেন, 'আংরেজরা চারিদিকে সহস্র চর রেখেছে গুরুদেব, এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পালান।'

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে মানসিংহ, শেষ অনুরোধ !'

'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া যা বলেন তাই শুনব।'

'শুনবে ত ?'

'হ্যাঁ—আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।'

'তবে আমাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দাও।'

মানসিংহের অনুরোধ উপরোধ অনুনয় কিছুই শুনলেন না তাত্যা। মানসিংহ বললেন' 'আপনি নিজেই ধরা দিন না !'

'না। সে আমি পারব না। ঝাঁসির রাণীর কাছে শপথ আছে। তা ছাড়া তাতে তোমার বিপদ বাড়বে। আর এতে তুমি পাবে পুরস্কার।'

অগত্যা মানসিংহ ইংরেজ কর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন, তাত্যা ধরা পড়েছে, তিনিই বুদ্ধি ক'রে ধরেছেন। ওঁরা যেন ব্যবস্থা করেন এখনই।

ইংরেজদের হাজতে গিয়ে তাঁতিয়া বহুদিন পরে শান্তিতে ঘুমোলেন।

শপথের মূল্য

১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস। এখন যেটাকে উত্তর প্রদেশ বলা হয়—সেই সমস্ত ভূখণ্ডটা জুড়ে সূর্যদেব প্রলয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ শুরু করছেন—যেন আগুনের তাণ্ডব চলেছে চারিদিকে।

ফতেপুরের পুলিশ সাহেব হিকমৎ উল্লা খাঁ কিছুতেই ঘরে টিক্‌তে পারলেন না তবু। তখনও বেলা চারটে বাজেনি, পথেঘাটে বেরোনো দায়, যাদের একান্ত না-বেরোলে নয়, তারাই কেবল বেরিয়েছে, নইলে বাকী সবাই—বন্ধদোর-জানালা এবং খসখসের পরদা—এর ভেতর করেছে আত্মগোপন।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, মানুষও আজ চুপ ক'রে বসে নেই। সেও শুরু করেছে আগুন নিয়ে খেলা। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যারাকপুর থেকে মীরাট পর্যন্ত—সেই আগুনেরই স্ফুলিঙ্গ এসে পৌঁচেছে এই ফতেপুরেও। এখানেও জ্বলেছে দাবানল। কিন্তু আগুন যদি শুধু বাইরেটা পুড়িয়েই থামত!

সে আগুন জ্বলেছে আজ প্রবল প্রতাপান্বিত হিকমৎ উল্লা খাঁ সাহেবের বুকেও।

তাই তিনি সূর্যের দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে—ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাগানের প্রান্তে বড় নিমগাছটার ছায়ায় মাটির ওপরই ধপাস ক'রে বসে পড়লেন। হাতে ছিল একখানা ভিজা গামছা—সেইটেতেই কপাল, মুখ, ঘাড় মুছে নিয়ে মাথায় চাপালেন।

না, স্বস্তি নেই কিছুতেই। ঘরে বাইরে, কোথাও না।

অথচ কয়েকদিন আগেও ত এমন ছিল না। টাকার সাহেবকে তাঁরা যেদিন সকলে মিলে হত্যা—হাঁ হত্যাই করেছিলেন—সেদিন পর্যন্তও ত না। এমন কি তার পরের দিন পর্যন্ত নয়। সেদিনও বিজয়গর্বেই গর্বিত ছিলেন তিনি, সার্থকতার আনন্দে প্রসন্ন ছিলেন। তবে আজ এ কী হ'ল?

টাকার। বিচারপতি টাকার। ঐ লোকটাই যত নষ্টের মূল! বেশ করেছেন তাঁরা লোকটাকে মেরে ফেলে। এখন তার আত্মাটাকে যদি পাওয়া সম্ভব হ'ত ত নখে টিপে মেরে ফেলতেন আবারও। তার জন্য এতটুকু অনুতাপ হ'ত না তাঁর।

বন্ধু। হ্যাঁ, টাকার সাহেব তাঁকে বন্ধুই মনে করতেন। তিনি ছিলেন বিচারপতি, হিকমৎ উল্লা খাঁ ছিলেন পুলিশের বড় সাহেব। দুজনের হৃদ্যতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে অত বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। টাকার একান্ত নির্বোধ ছিলেন—তাই এমনটা হ'তে পারল। তার জন্য হিকমৎ উল্লা খাঁ নিশ্চয়ই দায়ী নন!

খবর ত টাকার সাহেবও পেয়েছিলেন।

দিল্লী, মীরাট, অম্বালা, চারিদিকেই গোলমাল হচ্ছে, একথা টাকারের কানে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন, ফতেপুরের অন্যান্য সাহেব মেমদের এলাহাবাদ দুর্গে পাঠাবেন কেন? আর সংশয় যখন মনে দেখা দিয়েছিল নিজে কী ভরসায় রইলেন ফতেপুরে? ঈশ্বরের ভরসায়! ছোঃ! ক্রেস্তানদের

আবার ঈশ্বর। কী করলে সে ঈশ্বর? বাঁচাতে পারলে হিকমৎ উল্লা খাঁর দলবলের হাত থেকে?

বিচারপতি রবার্ট টাকারকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভুল করাই হবে। শুধু ধর্মভীরু নন।—একেবারে ধর্মপাগল ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করতে না শিখলে ভারতবাসীদের মুক্তি নেই, ওদের ভালর জন্যেই যীশুর বাণী প্রচার করা দরকার। বেচারীরা জানে না কী অমৃত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা।

তাই তিনি অবসর পেলেই, বা কাছারী থেকে ফিরে প্রত্যহই দেশীয় লোকজনদের ডেকে বাইবেল পড়ে শোনাতেন, ব্যাখ্যা করতেন যীশুর বাণী। তিনি ভাবতেন এদের উপকারই করছেন, এরা কৃতজ্ঞ থাকবে। আসলে ফল হ'ত উল্‌টো—হিন্দু-মুসলমান সকলেই—সামনে ভয়ে কিছু বল্‌তে পারত না, কিন্তু মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করত। ধর্ম কেড়ে নেবার ফন্দী বদমাইস লোকটার।

এদের দলে হিকমৎ উল্লাও ছিলেন।

অথচ তাঁকেই টাকার বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশী। যখন প্রথম গোলমেলে খবর এসে পৌঁছতে শুরু হ'ল তখনই তিনি হিকমৎ উল্লা খাঁকে ডেকে পাঠালেন, 'হিকমৎ এ কী শুনছি সব। এখানেও কি এসব হাঙ্গামা হবে নাকি?'

'পাগল হয়েছেন! এখানে করবে কে? এখানে কি সিপাহী আছে?'

'তা নেই। কিন্তু পুলিশ, স্থানীয় লোকজন?'

'তার জন্যে আমি ত আছি।' আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন হিকমৎ উল্লা!

'তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি ত?'

'খোদা জামিন!'

হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন ক'রে-ছিলেন টাকার—'ব্যস্! আমি নিশ্চিন্ত রইলুম!'

কিন্তু সবাই ঠিক টাকারের মত অত সরল এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী নয়। তারা হিকমৎ উল্লা খাঁর শপথের ওপর ভরসা ক'রেও বসে থাকতে পারলে না। ভয়ে ভয়ে এসে টাকারকে জানাল যে—হাওয়া ভাল নয়, তারা আর এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।

'বেশ ত, যারা যেতে চাও তারা চলে যাও। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেন সবাইকে। ওঁর নিজের পরিবারের লোকজনও সেই সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁরা সবাই ওঁকেও নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। বললেন, 'পাগল! আমার কাজ ছেড়ে কোথায় যাবো?'

'কিন্তু আপনি বাঁচলে ত কাজ। কী ভরসায় থাকবেন আপনি?'

'কেন ঈশ্বরের ভরসায়! ঈশ্বরের নামে শপথ করেছে হিকমৎ। সে যদি বা বেইমানী করে, আমি তাঁর ওপর আস্থা হারাব কেন? তোমরা যাও, আমি ঠিক আছি!'

ঠিকই রইলেন তিনি। হিকমৎ উল্লা খাঁ রোজ আসেন, গল্প করেন, বাইবেল শোনেন। শেষে একদিন শোনা গেল সাহেবদের খালি ঘর-

দোরে আগুন লাগানো হচ্ছে, লুঠপাট শুরু হয়ে গেছে। সারারাত উদ্বেগে কাটালেন টাকার, পরের দিন হিকমৎ কিন্তু এলেন না। তখন টাকার চিঠি লিখে পাঠালেন। এই ত অবস্থা—সরকারী কোষাগার পাহারা দেবার কী হবে? হিকমৎ যেন এখুনি আসেন—একটা পরামর্শ করা দরকার।

এইবার হিকমতের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল।

হিকমৎ বলে পাঠালেন, এখন বড় গরম, এই রোদে তিনি আসতে পারবেন না! বেলা পড়লে আসবেন—এবং স-দলবলেই। কোষাগারের জন্য ভাবনা নেই, ও ত এখন দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শার সম্পত্তি। জজ সাহেব বুঝি এখনও জানেন না যে কোম্পানীর রাজ চলে গিয়েছে? তিনি এখন নিজের ভাবনা ভাবুন, তাঁর ঈশ্বরকে স্মরণ করুন তিনি—কারণ তাঁর দিনও ফুরিয়ে এসেছে।

চাকরটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল খবরটা দিতে দিতে। তার চোখে জল।

'সাহেব এখনও বোধহয় সময় আছে। পালান শীগ্‌গির।'

টাকার হাসলেন। ওর পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে আশ্বস্ত করলেন। তারপর কাছে যা খুচ্‌রো নগদ টাকা ছিল সব দিয়ে, নিজের ঘড়িটি উপহার দিয়ে বললেন, 'পালাও বেটা। আমি ঠিক আছি। তুমি এবার নিজের জান বাঁচাও।'

কাছারী বাড়ীর সঙ্গেই ওঁর বাসস্থান। তিনি দোর-জানালা সব বন্ধ করলেন ভাল ক'রে। বন্দুক পিস্তল যা ছিল সবগুলিতে টোটা ভরলেন। সামান্য কিছু আহারও ক'রে নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন বাইবেল নিয়ে।...

হিকমৎ এক-কথার মানুষ। বেলা পড়তেই তিনি দেখা দিলেন—এবং স-দলবলেই। হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ল প্রায় এক হাজার লোক। তাদের চোখে রক্ত এবং লুঠের নেশা।

'তোমার ভগবানকে স্মরণ করো টাকার সাহেব। শেষের কথাটা ভাবো।' হিকমৎ নিজেই এগিয়ে এসে বললেন।

'কিন্তু তুমি তোমার খোদার নামেও শপথ করেছিলে হিকমৎ উল্লা খাঁ। ঈশ্বর সকলেরই সমান!' বদ্ধদোরের ভেতর থেকে টাকার সাহেব জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হিকমৎ উল্লা খাঁ বললেন, 'কুকুর বেরালের কাছে শপথ, তার আবার মুল্য কি?' আংরেজ কেরেস্তান কুত্তা ছাড়া কিছু নয়।'

'তবু ঈশ্বর ঈশ্বরই। তাঁর নামটা ত নিয়েছিলে—যার কাছেই নাও! এতটা বেইমানী ক'রো না হিকমৎ। পরকালে তোমাকেও জবাব দিতে হবে।'

'পরকালের এখনও দেরি আছে। ইহকালটা আগে ভোগ করি!'

হিকমৎ ইঙ্গিত করলেন, লোকজন এগিয়ে এসে জানালা দরজা ভাঙ্গতে শুরু করল। টাকার সাহেব এইবার ধরলেন হাতিয়ার। ছাদের একটা কোণ থেকে চালালেন গুলি। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর! এক-দুই-আট দশ—। একের পর এক লোক মাটি নিচ্ছে। একে একে ষোলটি লোক ঘায়েল্ হ'ল। কিন্তু হাজার লোকের ভেতর ষোলটা লোক গেলেই বা ক্ষতি কি! এধারে টাকারের টোটা এল ফুরিয়ে। দোরও ভেঙ্গে পড়ল এইবার। উন্মত্ত আক্রোশে

ঢুকে সেই শত শত লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল টাকারের ওপর—টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেললে তাঁকে। শেষবারের মত ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন তিনি—'ঈশ্বর ক্ষমা করো।'

বিচারপতি টাকার পরম বিচারপতির দরবারে গিয়ে হাজির হলেন এবার!

না, হিকমৎ উল্লা খাঁ নিজের হাতে আঘাত করেননি টাকারকে—এটা ঠিক। কিন্তু করলেও অনুতপ্ত হ'তেন না। কুকুর বেড়ালকে মেরে মানুষ অনুতপ্ত হয় না। বিশেষ যদি সে পোষা কুকুর বেড়াল না হয়। ঠিকই হয়েছে, উচিত শাস্তিই হয়েছে লোকটার। ওদের সবাইকে ভুলিয়ে ক্রীশ্চান করতে এসেছিল। তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। তারজন্য একটুও দুঃখিত নন তিনি। টাকারকে হত্যা করার পর তাঁর সম্পত্তি লুঠ করতেও তিনিই হুকুম দিয়েছিলেন বটে—কিন্তু তাতেই বা কি? যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল জনসাধারণের বিচারে—তার সম্পত্তিও জনসাধারণে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তাঁর বাড়ীতেও এসেছে কিছু। তাতেও এমন কিছু অন্যায় হয়নি। তিনিও কি জনতার একজন নন?

হু-হু ক'রে বইছে আতপ্ত হাওয়া। একেই 'লু' বলে। এ হাওয়া খালি-গায়ে লাগ্‌লে ফোস্‌কা পড়ে। এ হাওয়া মানুষের ঘাড়ের রক্ত শুষে নেয়, এ হাওয়া যমপুরীর হাওয়া।

মুখ কি পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিকমৎ উল্লা খাঁর!

নেশার মত সর্বশরীর কি ভেতরে ভেতরে টল্‌ছে তাঁর? কাঁপছে তাঁর হাত-পা? কিন্তু বুকের আগুন যে এর চেয়েও বেশী!

যে আতঙ্ক, যে অকারণ এবং অভূতপূর্ব ভয় তাঁকে ক-দিন ধরে পেয়ে বসেছে, যার বর্ণনা দেওয়া যায় না, যা উপহাসের ভয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা যায় না -- তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর দাবদাহের মধ্যে জ্বলতে রাজী আছেন !

হে খোদা ! যদি এই বিভীষিকা থেকে কোনমতে উদ্ধার পেতে পারতেন শুধু !

ঠিক সাত দিন আগে শুরু হয়েছে। টাকারের মৃত্যুর তিন দিন পর থেকে। দুটোর ভেতর কি কোন যোগাযোগ আছে ?

এ-কদিন ধরে তিনি নিজের মনেই প্রবল প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন ধারণার। কিন্তু আজ যেন কেমন আর জোর পাচ্ছেন না ! ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ছায়ার মত ফিরেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে গেলেই দু'পাশে এসে বসবে।

একটি কুকুর আর একটি বেড়াল !

কী ভয়ঙ্কর দেখতে দুটো জীবই ! কী কদাকার এবং বীভৎস ! কী হিংস্র তাদের চোখের চাহনি ! তারা ডাকেনা, সাড়া দেয়না, তাড়া করেনা, শুধু দু-পাশে বসে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতিকার ? হ্যাঁ—প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন বৈ কি ! লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তলোয়ার বর্শা বসিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ওদের গায়ে—কিন্তু সে অস্ত্র প্রয়োগ ওঁকেই উপহাস করেছে শুধু।

শূন্যে অস্ত্র আস্ফালনের মতই ফল হয়েছে। লাঠি ঘুরে এসেছে—ওদের গায়ে লাগেনি। সজোরে তলোয়ার চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন নিজেই। ওদের গায়ে লাগেনি কিছু, ওরা নড়েওনি একচুল।

সবচেয়ে মজা—আর কেউই যে দেখতে পায়না।

প্রথম দিনই স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, 'এ কুকুর-বেড়াল দুটো কোথা থেকে এল? ছ্যাখো ত—কী বিশ্রী!'

তিনি অবাক হয়ে বলেছেন, 'কুকুর-বেড়াল আবার কোথা থেকে পেলে? খোয়াব * দেখছ নাকি?'

'কী আশ্চর্য—দেখতে পাচ্ছ না? এই যে—'

আরও অবাক হয়ে বিবিজী উত্তর দিয়েছেন, 'কী হ'ল কি তোমার? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?' সত্যিসত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি। সুতরাং চুপ ক'রে যেতে হয়েছে!

এ ভয়টা হিকমতেরও হয়েছে বৈ কি!

সত্যিই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর?

কিন্তু কৈ? আর ত কোথাও কোন গোলমাল নেই। ক-দিন ধরে শহর লুঠ হয়েছে, তার হিসাবপত্র ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছেন তিনি। ট্রেজারী বা কোষাগারের টাকা নিজের বাড়ীতে এনে তুলেছেন, তাতেও কোন ভুলচুক হয়নি। নীল সাহেব কাশীকে সায়েস্তা ক'রে এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন খবর পেয়ে কানপুরে আজি-মুল্লা খাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছেন—সব কাজই ত চলেছে ঠিক ঠিক। সবাই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করছে, সকলে মেনে নিয়েছে তাঁকে নেতা ব'লে।

* স্বপ্ন।

তবে ?

এ কি দুর্বলতা তাঁর ?

মজা এই—দিনের বেলা শুধু ঘরের ভেতর গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া যায়। কাজের টেবিলে, শোবার ঘরে—সর্বত্র। বাইরে ওরা আসে না—দিনের বেলায় অন্তত। কিন্তু রাত্রে বাইরে শুলেও নিস্তার নেই, ঠিক দুটি দুপাশে এসে বসবে। ক-রাত ঘুম নেই তাঁর। চোখের পাতা বুজোতেও ভয় করে—যদি জানোয়ার দুটো এসে বুকে চেপে বসে ? গত তিন চার দিন শোবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছেন। কাজের ছুতো ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। চোখের কোলে কেন এমন গভীর কালির দাগ, চোখ দুটো কেন এমন রক্তবর্ণ—সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, ঐটুকু তবু সুবিধা হয় !···

তন্দ্রায় অবশ হয়ে আসছে শরীর। আঃ !

গরম হাওয়া—? তা হোক। হিকমৎ এখানে শুয়েই ঘুমোবেন !

কিন্তু ঘুম হ'ল না।

অকস্মাৎ তন্দ্রার মধ্যেই বজ্র গর্জনের মত কানে দুটি সামান্য শব্দ এসে পৌঁছল। 'মিঁউ'—আর 'ঘেউ' !

চম্‌কে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ ত—আজ ত এই দিবালোকেই, জ্যৈষ্ঠের এই তীব্র রোদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে—ঐ ত ! দুটিতে শান্ত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কী সাংঘাতিক দৃষ্টি ওদের। কী অবিশ্বাস্য ঘৃণা ওদের চোখেমুখে !

অয়্ খোদা ! এ কী করলে ! তিনি ত কোন অপরাধ

করেননি—একটা কাফেরকে মেরেছেন মাত্র। পাপের শাস্তিই দিয়েছেন বলতে গেলে। তবে? ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে শপথ ভেঙ্গেছেন? কিন্তু কুকুর বেড়ালের কাছে আবার শপথ করার মূল্য কি?

আবারও চম্‌কে উঠলেন তিনি।

হ্যাঁ—কথাটা তিনিই বলেছিলেন বটে—! টাকার সাহেবও জবাব দিয়েছিল. ঈশ্বর ঈশ্বরই!…

হিকমৎ উল্লা পাগলের মত ছুটে গেলেন কুয়াতলায়। বালতিটা নামিয়ে জল তুললেন এক বালতি। হড় হড় ক'রে মাথায় ঢাললেন সবটা। অসহ্য রোদে বাড়ীসুদ্ধ সবাই দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে, কেউ টেরও পেলে না!

আঃ! মাথাটা কি ঠাণ্ডা হ'ল?

চোখমুখ মুছে ফেললেন গামছায়। তাকালেন ভাল ক'রে। সে দুটো আছে কি? নেই। আপদ গেছে। অতিরিক্ত গরমেই বোধ হয়—আর মনের মধ্যে কদিন কথাটা দিনরাত তোলাপাড়া ক'রেই—

হিকমৎ সুস্থ বোধ করলেন খানিকটা। আবার নিম গাছটার দিকে চললেন। ঐ ছায়াতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে, নইলে শরীর আর টিকবে না। সত্যিই পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

কিন্তু—। দুচার পা এগিয়েই পিছনে একটা অশরীরী উপস্থিতি যেন অনুভব করলেন। কে যেন, কারা যেন চলেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। পিছন ফিরে তাকালেন। তারাই ত—অমোঘ নিয়তির মত নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে আসছে।…

পাগলের মত চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ উল্লা খাঁ।…

ছুটে বেরিয়ে পড়লেন নিজের বাগান থেকে। রাস্তায় পড়েও থামতে পারলেন না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন। পিছন ফিরে দেখবারও সাহস হ'ল না তাঁর···তারা আসছে কি না আসছে।···

রোদ পড়ে আসছে তখন। বাইরের বহ্নিতাণ্ডব যেন এবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দু একজন ঘরের বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। দোকানীরা এক-আধজন ঝাঁপ খুলেছে দোকানের। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কী হল কি কোতোয়াল সাহেবের। বাড়ীতে কারুর অসুখবিসুখ হ'ল না কি? কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে প্রশ্ন করতে করতে কোতোয়াল সাহেব দূরে গিয়ে পড়লেন—কোন প্রশ্নই তাঁর কানে যাচ্ছে না। কারণ তিনি ছুটছেন, ছুটছেন,—যেন পিছনে কোন আততায়ী তাঁকে তাড়া করেছে, প্রাণভয়ে তিনি ছুটছেন।···

অবশেষে একসময়ে তাঁকে থামতে হ'ল। কলিজার দম ফুরিয়ে এসেছে, বুকে যেন হাপরের পাড় পড়ছে। আর নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। ভারী শরীর—এতখানি ছুটে আসাই ত তাঁর উচিত হয়নি!

কিন্তু এ কি—?

এ কোথায় এসে পড়েছেন তিনি? এ যে কাছারী বাড়ীতে এসে থেমেছেন একেবারে!

দোর জানলা ভাঙ্গা—চারিদিক হা-হা করছে। আসবাব-পত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। কতকগুলো কাঠ্‌রা বাইরে এনে আগুন লাগানো হয়েছিল, তার ছাই পড়ে আছে এখনও। শ্মশানের মত মনে হচ্ছে বাড়ীটা।

আশ্চর্য। এবার আর পিছনে নয়। ওঁর নির্মম সহচর দুটি এবার চলেছে তাঁর আগে আগেই। যেন পথ দেখিয়ে চলেছে তাঁকে। ঐ ত ফিরে ফিরে ইঙ্গিত করছে—

অভিভূতের মত, মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্নভাবে এগিয়ে চললেন—পুলিশ সাহেব হিকমৎ-উল্লা খাঁ। ভেতরের দুটো বড় বড় ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন নিঃশব্দে।

উঁঃ! কী একটা দুর্গন্ধ! ও—ঐ যে সিঁড়ির কোণটাতে এখনও ক-খানা হাড় পড়ে আছে। শিয়াল কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে কতদিন ধরে কে জানে, মেদ প্রায় সবই গেছে, কঙ্কালের গায়ে লেগে আছে দু'এক টুক্‌রো পচা মাংস। তারই এত গন্ধ।

তবে কি এটাই টাকার সাহেবের দেহ? কে জানে! আজ আর চেনার ত কোন উপায় নেই!

সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে হিকমৎ উল্লা খাঁর মনে হ'ল কঙ্কালটা কথা বলছে। এ ওঁর কল্পনামাত্র—মাথা-গরমের কল্পনা—বার বার বোঝাতে লাগলেন মনকে, তবুও যেন কান পেতে রইলেন।

কী বলছে কবন্ধটা?

'খোদা জামিন!'

কিন্তু কার কণ্ঠস্বর এ? এ ত হিকমৎ উল্লারই গলা। এইখানে এই বাড়ীতে দাঁড়িয়েই যেন কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। হ্যাঁ—এই মাত্র ক-দিন আগে।

চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ। প্রাণপণ আর্তনাদের মত।

খালি বাড়ীতে কেমন একটা ভয়াবহ ধ্বনির তরঙ্গ তুলে প্রতিধ্বনিত

হ'তে লাগল শব্দটা। পাগলের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোতোয়াল সাহেব।

একখানা তলোয়ার পড়ে আছে পাশেই। হয়ত এইটে দিয়েই ওরা মেরেছিল টাকারকে। টাকারের বন্দুক নিয়ে চলে গেছে লুটেরার দল—তলোয়ারখানা ফেলে গেছে। রক্তমাখা তলোয়ার।

ও কি! কুকুর বেড়াল দুটো এখনও যায়নি। ইঙ্গিত করছে তলোয়ারটার দিকেই! ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন তলোয়ারখানা, পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ দুটো শয়তানের ওপর। কিন্তু আজও ব্যর্থ হ'ল সে আস্ফালন, শূন্যে আঘাত করার মত নিজেই মুখ থুব্‌ড়ে পড়লেন।

মনে হ'ল আজ এই প্রথম—কুকুর বেড়াল দুটো হেসে উঠল, তাঁকে বিদ্রূপ ক'রেই!

আর সহ্য করতে পারলেন না কোতোয়াল সাহেব—

সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে নিজের বুকেই বসিয়ে দিলেন—আমূল!

'অয়্ খোদা! মাফ্ করো এবার। দয়া করো!' অস্ফুটকণ্ঠে এই কথা ক'টা বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ল হিকমৎ উল্লা খাঁর দেহ।

'খোদা জামিন!' আবারও একটা শব্দ উঠল যেন কঙ্কালটার মুখগহ্বর থেকে। সেই সামান্য শব্দও বহুক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল খালি কাছারী বাড়ীটার শূন্য ঘরে ঘরে।

এক রাত্রি

গাঙ্গুলী মশাইএর বৈঠকখানায় রোজই সন্ধ্যেয় আমাদের আড্ডা বসত। তাস, পাশা, দাবা যেদিন যা খুশি খেলা হ'ত, আর বৌদির হাতের তৈরী কচুরী, সিঙ্গাড়া, গোটা দিয়ে মাখা মুড়ী কিম্বা মরিচ ও ঘি মাখা চিঁড়ে ভাজা খাওয়া হ'ত! কমিসরিয়েটে কাজ ক'রে ভদ্রলোক পেন্সন নিয়ে দেশে এসে বসেছেন। ছেলেপুলে নেই—কাজেই পয়সারও অভাব নেই। আমাদের খাইয়ে এবং নিজেরা খেয়ে যে কদিন ফুর্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যায়—এই ছিল তাঁর মনের ভাব।

আশু রক্ষিত, গোষ্ঠ হালদার আর নিতাই পাকড়াশী বুড়োদের মধ্যে এই তিনজন আর ছোকরাদের, আমি, সুশীল আর ইন্দু আমরা নিয়মিত যেতুম। এ ছাড়াও দুচার জন ক'রে অনিয়মিত অতিথি প্রায়ই জমত। ওটা যেন আমাদের নেশার মত হয়ে গিয়েছিল।

সব দিনই যে খেলা হ'ত তা নয়, এক একদিন গল্পও হ'ত—গাঙ্গুলী মশাই কত দেশ বেড়িয়েছেন সেখানকার গল্প—তাঁর সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই ভাল লাগত। তাই পরশুদিন সন্ধ্যে না হ'তে হ'তেই বৃষ্টি নামল ব'লে আমরা সব ধরে পড়লুম, গল্প শোনাতে হবে। বৃষ্টি কি একটু আধটু? সে যেন প্রলয় ঘনিয়ে এল একেবারে। যেমন তুমুল বৃষ্টি তেমনি আকাশের ডাক, সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও। শীগ্‌গির যে থামবে সে রকম কোনও সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

ঘরের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে মুড়িশুড়ি দিয়ে আমরা ক'টি লোক বসে আছি, সামনে মুড়ির থালা আর গরম বেগুনি, বৌদি পাশের ঘরে বসে স্টোভে ভেজে মাঝে মাঝে দিয়ে যাচ্ছেন—এইত গল্পের সময় !

গাঙ্গুলী মশাই একখানা আলুর বড়ায় কামড় দিয়ে বললেন 'গল্প আর কি বলব, সব গল্পই ত তোমরা শুনে ফেলেছ। যে গল্পটা শোননি সেইটেই আজ শোনাব। কে জানে কেন আজ কেবল অসিত মিত্তিরের কথটাই মনে পড়ছে।'

একটু নড়ে চড়ে—বেশ জ াঁকিয়ে বসে গাঙ্গুলীমশাই শুরু করলেন—

তোমাদের মনে আছে বোধ হয় আমি ১৯১০ সালে প্রথম মীরাটে বদলী হই। ওখানে চার বছর থাকবার পর ১৯১৪ সালে লড়াই বাধতে পিণ্ডিতে চলে যাই। মীরাটের কথা তোমাদের বহুবার বলেছি, কাজেই সে সব কথায় এখন আর দরকার নেই। গল্পটাই আরম্ভ করি।

ওখানে গিয়ে পর্যন্ত অসিত মিত্তিরের কথা শুনছি। লোকটা আগে নাকি কমিসেরিয়েটে কাজ করত, পেন্সন নিয়ে মীরাটেই আছে—প াঁড় মাতাল, পেন্সন পাবার পরের দিনই পেন্সনের টাকা ফুরিয়ে যায়, এমনি অবস্থা। ওখানে যে ক'ঘর বাঙ্গালী আছে তাদের সাহায্যেই কোনও রকমে পেটে ভাত যায়। বহুবার ওর পেন্সন বন্ধ করার কথা উঠেছে কিন্তু ও নাকি মিউটিনির সময়ে অনেক সাহেবের প্রাণ বাঁচিয়েছিল ব'লে ওপরওয়ালা সাহেবেরা পেন্সন বন্ধ করতে দেয়নি। এই সব শুনতুম।

শুনেছিলুম ঐ পর্যন্ত, লোকটিকে দেখিওনি, দেখবার কৌতূহলও

ছিলনা। ওখানে যাবার মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যের সময় বাড়ীতে বসে আছি, চাকর এসে খবর দিলে একটি বাঙ্গালী বাবু দেখা করতে চায়। একটু আশ্চর্য হলুম, কেননা আমার বন্ধু বান্ধবদের সকলকেই চাকরটা চিনত—তাছাড়া আর বাঙ্গালী কে এখানে আছে, আর কেনই বা আসবে? যাই হোক—বল্লুম এখানে নিয়ে আয়।

একটু পরেই লোকটি এসে ঘরে ঢুকল! অত্যন্ত বুড়ো, দেখলে মনে হয় যেন আশী নব্বুই বছর বয়স হবে। পরে শুনেছিলুম মোটে পঁচাত্তর, মদ খেয়ে খেয়ে ঐ রকম হয়েছে। রোগা লম্বা চেহারা, এক কালে হয়ত সুন্দরই ছিল কিন্তু অত্যাচারে এখন কিছু অবশিষ্ট নেই। মুখের দাড়ী গোঁফ কামানোর অভ্যাস আছে কিন্তু বোধ হয় দশ-বারো দিন কামানো হয়নি। কাপড় আর ছেঁড়া সার্ট দুটোই এত ময়লা যে দেখলে গা বমি-বমি করে। এধারে ঐ রকম ভিখিরীর হাল হ'লে কি হয় ছেঁড়া সার্টের ফাঁক দিয়ে এক ছড়া সোনার হার চিক্ চিক্ করছিল।

আগন্তুক লোকটি হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, 'প্রাতঃ প্রণাম গাঙ্গুলী মশাই। আমি অসিত মিত্তির, নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। মাতাল বলে আমার একটা খ্যাতি আছে।'

লোকটার নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে গেলুম। এই তাহ'লে অসিত মিত্তির! বহু কু-খ্যাত।

চেয়ারটা দেখিয়ে বললুম 'বসুন। কি দরকার আপনার?'

অসিত বললে, 'আমার নাম যখন শুনেছেন; তখন সবই শুনেছেন। বড় অভাব, মাসের শেষ হয়ে এল বুঝতে পারছেন ত? কিছু দিতে হবে।'

আমার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল। একটু ঝালের সঙ্গেই বললুম, 'কেন? মদের দাম?'

অসিত হেসে বললে, 'আজ্ঞে না। পরের পয়সায় মদ খাই না। পেন্সনের টাকা পেয়ে কিছুদিন মদ খাই; ঘরের জিনিস পত্তর যতদিন কিছু ছিল তাও বেচে মদ খেয়েছি। তার পর যখন কিছুই থাকে না তখন ভিক্ষে করি প্রাণধারণের জন্য। ওতে শুধু ভাতই হয়, মদ খাওয়া হয় না! সকলেই আমাকে জানেন, দয়া ক'রে বুড়ো মানুষকে দেনও কিছু কিছু। আজ হাতে কিছুই ছিল না, সমস্তদিন ও কর্ম্ম হয়নি। আপনার নাম শুনেছিলুম, ভাবলুম যখন তিনমাস এসেছেন তখন আমার কথা সবই শুনেছেন নিশ্চয়। নূতন লোকের কাছে টপ ক'রে যাইনা - নিজের খ্যাতিটা শোনবার অবসর দিই।'

লোকটা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। রাগ বেশী ক্ষণ রাখতে পারলুম না? হেসে বল্লুম, 'একটু চা খাবেন?'

সে হাত যোড় করে বললে, 'তা হ'লে তো হাতে স্বর্গ পাই। কতদিন খাইনি।'

চাকরকে ডেকে বাড়ীর মধ্যে থেকে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা আনতে বলে দিলুম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'থাকেন কোথায়?'

সে বল্লে, 'যেখানে হোক। একটা ঘর আছে অনেকদিন ভাড়া দিইনি কিন্তু বাড়ীওলা দয়া ক'রে থাকতে দেয়। যেদিন মাত্রা বেশী হয় সেদিন নর্দমায় পড়ে থাকি আর ফিরতে পারি না। মাসের শেষে মদ যখন জোটে না, তখন সেখানে গিয়ে রাত্রে শুই। শীতকালে তারাই একখানা কম্বল দেয় আবার ফিরিয়ে নেয়, নইলে হয়ত বেচে মেরে দেব।'

বললাম, 'আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই ?'

ততক্ষণ খাবার এসে পৌঁচেছে, সে খেতে খেতে বললে, 'কোথা পাব বলুন ? মা ত আমার ছেবেলাতেই মারা গেছেন একটা ভাই ছিল সেও অনেক দিন গেছে। তা ছাড়া তারা বাঙ্গলায় থাকতো।'

'বিয়ে করেননি ?'

অসিত গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, 'না। তারই প্রতীক্ষায় আছি। সে অনেক কথা—একদিন বলব এখন।'

কথাটা ঘুরিয়ে অন্য কথা পাড়লুম, 'কিছুই নেই বলছেন কিন্তু গলার হার ছড়াটা কি সোনার নয় ?'

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললে, 'খাঁটি সোনার। কিন্তু ও সোনার হার বেচে মদ খাবার মত মাতাল অসিত মিত্তির কোনও দিনই হবে না। তিপান্ন বছর আগে এ হার গলায় একজন পরিয়ে দিয়েছিল, মরবার আগে কেউ আমার গলা থেকে খুলতে পারবে না, দেহে প্রাণ থাকতে কাউকে খুলতে দেব না।···শুনবেন সে সব কথা ?'

আমি সাগ্রহে সম্মতি দিলেম। বুড়া মানুষ—কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে যেন সব মাথার ভেতর গুছিয়ে নিলে, তারপর বলতে শুরু করলে—

তখন আমার বাইশ বছর বয়স, মীরাটে আমি বদলি হয়ে আসি যখন। আমিও এলুম আর মিউটিনীও বাধ্‌ল। এখন যা মীরাট দেখেচেন তিপান্ন বছর আগে মীরাটের চেহারা ছিল অন্য রকম। চওড়া রাস্তা একটাও ছিল না বললেই হয়। এখন ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকটা অনেকটা ভদ্রলোকের মত হয়েছে, তখন ওখানকার অবস্থাও খারাপ ছিল। অত্যন্ত নোংরা সহর এই মীরাট। তবু আমাদের

ভাল লাগত। পিণ্ডি কিংবা অমৃতসরের চেয়ে এখনও অনেকের মীরাট ভাল লাগে।

মিউটিনির সময় আমরা যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলুম আমাদের যে সে কি অবস্থা তা মুখে বোঝাবার নয়। "রামে মারলেও মারবে আর রাবণে মারলেও মারবে" একটা কথা আছে না? আমাদের ঠিক সেই মারীচের দশা। সিপাইরা সন্দেহ করত আমরা ইংরেজের দলে আর ইংরেজরা মন করত যে আমরা সিপাইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছি। নিরপেক্ষ থাকবারও যো নেই, সিপাইদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা তাদের দলে আর ইংরাজদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা প্রাণপণে সিপাইদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছি। কখন যে কার কাঁচা মাথাটি কাটা যায় তার ঠিক ছিল না।

শেষে আমরা যে কজন বাঙালী ছিলুম একত্র থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। মরি ত একসঙ্গে মরব আর যদি আত্মরক্ষা করতে পারি, একত্রে থাকলেই তা করা সম্ভব হ'বে।

আগেই বলেছি আমার তখন বাইশ বছর বয়স, চেহারাটাও ছিল জোয়ান মতো (সুপুরুষ বলেও একটা খ্যাতি ছিল) আর বুকে সাহসও ছিল অসীম। বিপদকে খুব কমই ভয় করতুম। সেইজন্যে সাহেবরা আমাকে ভাল বাসত খুব, কাজকর্ম তখন ত একরকম বন্ধ কিন্তু গোরাদের খাবার যোগানোটা লুকিয়ে লুকিয়ে করতেই হ'ত, তা' নইলে ওদের কোনও উপায় ছিল না। একাজে অবশ্য পয়সাও খুব ক'রে নিয়েছে সকলে; মিউটিনীর পর প্রাণ নিয়ে যেসব বাঙ্গালী দেশে ফিরে যেতে পেরেছে, তারা দস্তুরমত টাকা নিয়েই ফিরেছে।

একদিন আমাদের ইমিডিয়েট সুপিরিয়র হলস্টন সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, অসিত একটা কাজ করতে হ'বে যে !

আমি বললুম, বল সাহেব কি করতে হবে ?

সাহেব বললেন, আমার স্ত্রী লুসী কানপুরে তার ভায়ের কাছে ছিল জান ত ? ওর ভাই পরশু মরে গিয়েছে, লুসী অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। একটা জেলের বাড়ী লুকিয়ে আছে। ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে সোজা উত্তর দিকে গিয়ে হুসেন সাহী সড়ক বলে যে রাস্তাটা খালের ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে যাবে। খালের ধারে ভগবান জেলের ঘর খুঁজে বের করো—তাকে এই আংটীটা দেখালেই বুঝতে পারবে। আর লুসীকে এই চিঠিটা দিলে সে বুঝবে যে তোমাকেই আমি পাঠিয়েছি তাকে আনবার জন্যে। পারবে তাকে আমার কাছে এনে দিতে ?

বুকটা আমার একবার কেঁপে উঠল। তারপর জোর ক'রে সাহস এনে বললুম, পারব !

সাহেব বল্লেন, ভাল ক'রে ভেবে দেখ, সিপাহীদের অবরোধের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আর সব চেয়ে শক্ত কথা—আনতে হবে। ভগবান অনেক কষ্টে এসে আমায় খবর দিয়ে গেছে কিন্তু সে সঙ্গে আনতে সাহস করেনি। চারিদিকে শত্রু তার মধ্যে দিয়ে মেমকে নিয়ে আসা—বুঝ্‌ছ ত ? তুমিও যাবে সে-ও যাবে ? কি বলো, সাহস হয় ? পারবে ?

আমি বললুম, আমার দেহে প্রাণ থাকতে মেম সাহেবের কোন অনিষ্ট হ'বে না, আর তাঁকে এনে পৌঁছে বেবই। তাঁকে যদি নিয়ে আসতে না পারি সাহেব, তাহ'লে আমিও ফিরব না।

সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলেন। বললেন, আমি জানি তোমার মত চতুর এবং সাহসী আর কেউ নেই মীরাটের মধ্যে। তাই সকলের মধ্য থেকে তোমায় বেছে নিয়ে আমার নিজের প্রাণের চেয়েও যা দামী তারই ভার দিলুম। এই নাও, চিঠি আংটী আর এই পিস্তল। পিস্তলটা কাছে রেখো, দরকার হ'তে পারে। তুশটা টাকাও রাখ, যদি প্রয়োজন হয় ঘুষ দেওয়া চলতে পারে। ফিরে এলে হাজার টাকা পাবে।—কখন যাবে?

আমি সেলাম ক'রে বললুম, সন্ধ্যার সময়।

বাড়ী ফিরে এসে কিছু খেয়ে নিলুম। তারপর কাপড়ের মধ্যে খাকি হাফ্ প্যাণ্ট একটা পরে নিয়ে জামা ঝুলিয়ে দিলুম। কেননা দৌড়বার দরকার হ'লে কাপড়ে বড় অসুবিধা হয়। তারপর টাকা তুশ' কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজে দিলুম। পিস্তলটি নিয়েই বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম, কেননা তখন এখনকার মত অত ছোট রিভলবার পাওয়া যেতনা। যাই হোক কোন রকমে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যের একটু আগেই বেরিয়ে পড়লুম।

শহর যেন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। ঘর বাড়ী ভাঙ্গা, পচা মড়ার গন্ধ, বারুদের গন্ধ আর মধ্যে মধ্যে গুলির শব্দ— সে যেন এক বীভৎস ব্যাপার। রাস্তায় বেরোলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হ'ত! খানিকটা দূর গিয়েই জন-কতক সিপাহীর পাল্লায় পড়লুম, প্রশ্ন হ'ল, কোথা-যাচ্ছ?

বললুম, ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি, বড় ব্যায়রাম ওর।

প্রশ্ন হ'ল—ভাই কোথা থাকে?

জবাব দিলুম, হুসেন শাহী সড়কে।

তবু তারা ইতস্ততঃ করতে লাগল। একজন প্রস্তাব করলে যে আমার সঙ্গে লোক দেওয়া হোক, মিথ্যা কথা প্রমাণ হ'লে আমায় মেরেই ফেলবে। আমি সোৎসাহে সম্মতি দিয়ে বললুম, বেশ ত তাই চল না, আমিও খানিকটা নিরাপদে যেতে পারি তাহ'লে। তখন তারা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা যাও—।'

দুধারে সিপাইদের তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে আবছায়া অন্ধকারে যতটা সম্ভব সতর্ক হয়ে চলেছি, চারিদিকে চোখ রাখতে হ'চ্ছে। মধ্যে মধ্যে যেন পথের মধ্যে থেকে ফুঁড়ে উঠছে সঙ্গীনের খোঁচা, আর সেই প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছি!

যে রকম অবস্থা, তাতে বেশ বুঝলুম, এ পথ দিয়ে ফেরবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। উপায় কি? মনের মধ্যে দ্রুত ভাবতে ভাবতে চললুম। কোনও পথটাই যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে হয় না। কিন্তু কথা দিয়েছি যখন তখন আর বৃথা ভেবে কি হবে?

হুসেন শাহী সড়কের মোড়ে পৌঁছেও বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। ওরা অত সহজে ভোলেনি। বলে, কোথায় তোমার ভাই থাকে, কার বাড়ী, সঙ্গে যাব। আমি 'চল' বলতে দুটো সিপাই সঙ্গে যেতেও লাগল। আমি বাইরে খুব সাহস দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে যাচ্ছিলুম বটে কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণছিলুম। তবে খানিকটা গিয়ে, বোধ হয় আমার ধাঁজ-ধরণ দেখে তাদের মনে বিশ্বাস এল, তারা আপনিই ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

এ রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন ও নিরাপদ। একটু জোরে চলে আধঘণ্টার মধ্যেই খালের ধারে গিয়ে পৌঁছলুম। তখন বেশ অন্ধকার

হয়েছে। একটা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, ভগবান জেলের বাড়ী কোথায় ?

সে একটু ইতস্ততঃ করে সন্দিগ্ধভাবে ভগবানের বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে। আমি তার হাতে একটা টাকা দিয়ে ভগবানের বাড়ী হাজির হলুম। তার হাতে আংটি দিতে সে পিদিমের আলোয় আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সামনের দোরটা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর নানা ঘর ঘুরে—সম্ভবত সেটা তাদের গোয়ালঘর—পেছনের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। ঘরের মধ্যে একটা খাটিয়ার ওপর বসে ছিল,—লুসী হলস্টোন।

এই আমি লুসীকে প্রথম দেখলুম। ১৯।২০ বছর বয়স, এবং অপূর্ব সুন্দরী। সে রূপ একহাজার মেয়েছেলের মধ্যেও নজরে পড়ে। পোশাকটা বদলাবার অবকাশ হয়নি বলে একটু ময়লা এবং মুখেও অনেক দিন পাউডার পড়েনি, সুতরাং তার স্বাভাবিক রূপই আমার নজরে পড়ল এবং মুগ্ধ হলুম।

চিঠি খানা পড়ে সে একটু মিষ্টি হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। আমিও শেকহ্যাণ্ড করলুম! সেই আমাদের প্রথম স্পর্শ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন আমরা বেরোব ?'

আমি বললুম, এখনই বেরোব কিন্তু তার আগে আমি ভগবানের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।

ভগবানকে ডেকে বললুম, বাপুহে যে পথে এসেছি সে পথে ত যাওয়া অসম্ভব। অন্য কোনও পথ টথ আছে কিনা বলতে পারো ?

ভগবান অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, 'আমার বাড়ীর উত্তর দিকে এই যে বনটা দেখছেন এটা খালের ধার দিয়ে অনেকটা গেছে। এর

মধ্যে একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ আছে বটে, সেটা দিয়ে গেলে ছাউনীর দিকে অনেকটা এগিয়েও যেতে পারবেন কিন্তু তারপর শহরে পড়তেই হবে।'

পড়তেই যদি হয়, কি আর করা যাবে বলো। বরং তাহ'লে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।

ভগবান বললে, 'চলুন আমি খানিকটা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আলো জ্বেলে ত যেতে পারবেন না। বনের মধ্যেও সিপাইদের তাঁবু আছে। আলো দেখলে ওরা সন্দেহ করবে।'

আমি বললুম, দেশলাই আছে সঙ্গে, বাতিও আছে। দরকার হয় জ্বেলে নেব। এখন অন্ধকারেই চলব।

সে-ও অভয় দিয়ে বললে, 'রাস্তা প্রায় সোজাই চলে গেছে।'

লুসীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানের পিছু পিছু বেরোন হ'ল। দুর্গা স্মরণ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে দারুণ বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লুম, যা করেন তিনি।

অতি সন্তর্পণে ভগবান দোর খুলে বাইরে এলো, আমরা ওর পিছনে পিছনে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লুম। একটুখানি গিয়েই বন আরম্ভ হ'ল। বনের মধ্য দিয়ে যে সঙ্কীর্ণ পায়ে হাঁটা পথের সরু রেখা চলে গিয়েছে সেইটে দেখিয়ে দিয়ে ভগবান ফিরে গেল। আমরাও সেই পথ ধরে চলতে শুরু করলুম।

একে কৃষ্ণপক্ষের রাত তায় ঐ নিবিড় বন, সূচীভেদ্য অন্ধকার কা'কে বলে তা বেশ বুঝতে পারলুম। একটু গিয়েই লুসী হোঁচট খেয়ে একটা গাছের উপর গিয়ে পড়ল। আমি তখন ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললুম, না হয় আমার হাত ধরুন।

সে একটু ইতস্তত ক'রে আমার হাতে হাত দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এত নরম ওর হাত যেন একমুটো শিউলি ফুল! ভয়ে একটু কাঁপছিল, অল্প অল্প ঘাম তাতে—সে হাতে হাত দিতে ভয় হয়।

মিনিট পাঁচেক ঐ ভাবে চললুম। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে যাচ্ছিলুম। আমি আগে আগে একটু বেঁকে, সে আমার হাত ধরে পিছু পিছু। আমি হাতড়ে হাতড়ে বনের মধ্যে পথ দেখছিলুম, কেন না এত অন্ধকার যে লুসীর সাদা পোশাকটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, পথ ত দূরের কথা। সহসা একটা কি ঠিক আমার পাশে সড়্ সড়্ করে নড়ে উঠ্‌ল। ভয়ে আমারও বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, লুসী কিন্তু একেবারে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। একটুখানি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝলুম যে ওটা কোন বন্য জন্তু কিংবা ইঁদুর হবে, তখন আবার চলতে আরম্ভ করলুম।

এবার চলা কিন্তু একটু মুস্কিল হ'ল, কেন না লুসী একেবারে আমার ডান হাত আঁকড়ে ধরে যাচ্ছিল সুতরাং পাশাপাশিই যেতে হচ্ছিল অথচ পাশাপাশি চলবার মত পথ সে নয়। তবুও যেতে লাগলুম যতটা সম্ভব ওকে ভাল পথে রেখে নিজে ডালপালার আঘাত খেতে খেতে।

কে ওকে সেই প্রথম দেখাতেই আমায় বিশ্বাস করতে শেখালে জানিনা কিন্তু সে ঐ নিশীথ রাত্রে গাঢ় অন্ধকার বনপথে আমাকেই একান্ত নির্ভর মনে ক'রে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল। তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে, এত কাছে কাছে চলেছি যে প্রায়ই আমি তার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করছিলুম

আমার মুখের উপর, খুব নরম ছুখানি হাতের স্পর্শ আমার বাহুতে।

মিনিট দশেক যাবার পর ডান দিকে বনের মধ্যে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। মনে পড়ল ভগবানের কথা, বনের মধ্যেও সিপাইদের তাঁবু আছে। একটু দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করলুম, তারপর জামার মধ্যে থেকে পিস্তলটা বার ক'রে বাগিয়ে ধরে আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলুম।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেখান থেকে কোনও বিপদই এল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা সেই আলোর ক্ষীণ রেখাটিকে ফেলে এগিয়ে চলে এলুম। কিন্তু বিপদ এল অপ্রত্যাশিত ভাবে—সহসা পায়ের কাছে কি একটা সর সর ক'রে উঠল। এত কাছে শব্দটা যে লুসী ভয়ে একটা অস্পট শব্দ ক'রে উঠল। আমারও মনে হ'ল শব্দটা সরীসৃপ জাতীয় জীবের, তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি ধরালুম। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই, একটা সাপ আস্তে আস্তে বনের মধ্যে সরে যাচ্ছিল। লুসী আরও ভয় পেল, একেই পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারপর ভয়ে যেন ভেঙ্গে পড়ল। ওর কপালে গলায় ঘাম দেখা দিল, আমার হাতের ওপরে ভারটা যেন ক্রমেই বেশী মনে হ'তে লাগল। ওর ভয় দেখে অগত্যা আমি বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগলুম।

অন্ধকার বনের মধ্যে বাতির আলো বহুদূর যায়—তার প্রমাণ পেলুম একটু গিয়েই! একটা গাছের বাঁক ফিরেই গিয়ে পড়লুম ছুই সিপাই-এর সামনে। ছুজনের হাতেই বন্দুক। মেম সাহেব, বিশেষতঃ সুন্দরী দেখেই সিপাই ছুটো উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল এবং ছু-পা

এগিয়েও এল। এক মুহূর্ত বোধ হয়—আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বেশী ব'লেই কর্তব্যটা চট ক'রে মাথায় এসে গেল। বাতিটা টপ্ ক'রে মাটিতে ফেলে দিয়েই পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলুম, তারপর লুসীকে একরকম মাটি থেকে তুলে নিয়ে গাছের ফাঁকে সরে গেলুম। আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে সিপাই দুটো ঘাবড়ে গেল। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে একজন একেবারে আমার হাতের কাছে এসে পড়ল। আমি পিস্তলের বাঁটটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলুম। পিস্তলের শব্দে লোক এসে পড়বে বলে গুলি করতে পারলুম না। কিন্তু ওতেই কাজ হ'ল, একটা শব্দ ক'রে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল. খুব সম্ভব মৃত অবস্থায়। বাকী সিপাইটা ঐ আওয়াজ পেয়ে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে এগোতে যাচ্ছিল, আমি পেছন থেকে ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলুম। তারপর ওরই বন্দুকের কুঁদোয় ওকে অজ্ঞান করলুম। লুসী ইতিমধ্যে মূর্ছা যাবার মতো হয়েছিল, ওর অর্দ্ধ-অচৈতন্য দেহটা প্রায় টানতে টানতে ধরে এগিয়ে চললুম।

বনের সীমা প্রায় পেরিয়ে এসেছিলুম। বনের মধ্যে লুকোবার জায়গা ছিল, বনই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, শহরে পড়্‌লে যে কি অবস্থা হবে তাই ভেবে আমার মাথা খারাপ হ'বার যোগাড় হ'ল।···এবং সে আশঙ্কা যে খুব অমূলক নয় তা একটু পরেই বেশ বুঝ্‌তে পারলুম। কারণ দূর থেকে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানের গম্ভীর আওয়াজ। হয় সিপাইরা ক্যান্টনমেণ্ট আক্রমণ করেছে, নয়ত গোরারাই সিপাইদের আক্রমণ করেছে। যাই হোক, আমরা খুব নিরাপদ নয়, কারণ সকলেই এ সময় সতর্ক, জাগ্রত।

কে বললুম, মনে একটু সাহস করুন মিসেস্ হলস্টোন এ সময় ভয় পেলে চল্‌বে না, তাতে বিপদ বাড়্‌বে।

লুসী যেন নিজেকে একটা প্রাণপণ নাড়া দিলে। তার মিষ্টি গলার আওয়াজও শোনা গেল, 'আমি প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছি, মিষ্টার মিটার।'

বনের পথ ছেড়ে একটা মাঠ—মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা গিয়ে একেবারে শহরের মধ্যে পড়েছে। মাঠের মধ্যে পড়ে আমাদের দস্তুরমত সাবধান হ'তে হ'ল, কেন না বনের আবরণ আর রইল না। লুসী যত দূর সম্ভব নিজেকে গোপন ক'রে আমার সঙ্গে প্রায় মিশে চল্‌তে লাগ্‌ল। ওর মুখটা আমার কাঁধের আড়ালে লুকিয়ে রাখ্‌ল, তা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

মেঠো পথ পার হয়ে যেমন পাকা সড়কে উঠ্‌তে যাব, হঠাৎ পাশের একটা ঘরের দোর খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। সে লোকটার হাতে একটা মাটির পিদিম, সে লুসীর ভয়ার্ত মুখ দেখে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, 'আরে এ যে মেম সাহেব।'

মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা বের করে ওর মুখের সাম্‌নে ধর্‌লুম, সে ব্যাটা যেন একটু অভিভূত হয়ে উঠ্‌ল, তারপরেই পিদিমটা মাটিতে ফেলে ছুটে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। এবারেও আমি শব্দ হবার ভয়ে গুলি করতে পার্‌লাম না। সে কিন্তু সেই সুযোগে বাড়ীর অন্য দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে উধ্বর্শ্বাসে ছুটতে লাগ্‌ল। বুঝ্‌লুম যে, সিপাইদের খবর দিতে গেল। আর রক্ষা নাই।

লুসী সভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর্‌লে, 'কি হবে মিষ্টার মিটার?'

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ভয় পাবেন না। আমার দেহে প্রাণ থাকৃতে আপনার কোনও ভয় নেই।

ওকে অভয় দিলুম বটে, এবং সেও একান্ত নির্ভয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলে কিন্তু আমি নিজে মনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতে পারলুম না।

খানিকটা বড় রাস্তা ধরে যাবার পরই বুঝলুম আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। দূরে একদল সিপাহী মার্চ ক'রে আসছে, তাদের মশালের আলোয় ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হ'ল। আমাদের পূর্বের বন্ধুটি যে ওদের সংবাদ দিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন উপায় কি?

লুসী বল্‌লে, 'ফিরে যাওয়া যাক্—'

আমার কান কিন্তু তখন লুসীর বীণাকণ্ঠের দিকে ছিল না, খুব পেছনে বড় আর একদল ফৌজ মার্চ ক'রে আস্‌ছে, তারই পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আমি চারিদিকে একবার চেয়ে নিলুম। দুদিকে মাঠ, মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাতে গেলেও ওদের নজরে পড়্‌ব এবং সে সময় যে গুলি-বৃষ্টি শুরু হবে, সে কথা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছিল না। অথচ দাঁড়িয়ে ভাববারও বিশেষ সময় নেই, ওরা এসে পড়ল ব'লে।

সহসা নজর পড়ল পায়ের তলায়। শহরের বড় জল নিকাশের নালাটা বয়ে গেছে ঠিক নিচে দিয়ে এবং রাস্তাটা ঠিক রাখ্‌বার জন্য একটা প্রকাণ্ড খিলানের ওপর কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে। নিজের কর্তব্য স্থির কর্‌তে দেরি হ'ল না। লুসীকে বললুম ভয় পাবেন না, মিসেস হলস্টোন, দুদিকে শত্রু এসেছে বটে, কিন্তু আমরা ওদের ফাঁকি দেব। আসুন, এই কালভার্টটার নীচে যাই।

লুসীর ঠোঁট কাঁপল কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। বেশী

দেরি হ'লে সিপাইদের নজর পড়তে পারে বলে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে নীচে নেমে গেলুম। তখন জল বেশী নেই, পাঁকও অনেক শুকনো। খিলানের নীচে কত কি জন্তু বাসা করেছিল, তারা এই আকস্মিক উপদ্রবে কলরব ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। খিলানটা উঁচু হ'লেও এত উঁচু নয় যে দাঁড়ান যায়, কোনও রকমে কষ্ট ক'রে দাঁড়ালুম।

দৈবক্রমে দু' দল সিপাই ঠিক পোলের উপর এসেই মিলিত হ'ল। তাদের গোলমালের মধ্যে এটা বেশ বুঝ্‌তে পারলুম যে, রীতিমত একটা লড়াই আসন্ন। পেছনের বড় দল যাচ্ছে ক্যাণ্টনমেণ্ট লুঠ করতে এবং ছোট দলকেও ডাক্‌ছে সঙ্গে যেতে, ক্যাণ্টনমেণ্টের গোরারা নাকি অন্যত্র বিশেষ ব্যস্ত আছে, এই ঠিক অবসর।

এই সব বলা-কওয়া চলছে এমন সময় দূরে আর একটা হৈ চৈ শুনা গেল। তার কারণও শীঘ্র বুঝলুম, একটা ছোট গোরা-পল্টন আসৃছে, হয়ত সিপাইদের ষড়যন্ত্র আগেই তাদের কানে গেছে।

কতক সিপাই পোলের ওপর থেকে খানিকটা এগিয়ে গেছে এখন সময় গোরারা এসে পড়ল। রীতিমত লড়াই বাধল দু'দলে, মুহুর্মুহুঃ গুলি বৃষ্টি হ'তে লাগল। মৃত দেহের ত কথাই নেই, পোলের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তলোয়ার ও সঙ্গীন দুইই ব্যবহার হচ্ছিল বুঝলুম, কেন না একটা কাদামাখা মুণ্ডু গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল আমার পায়ে, আর একবার একখানা হাত ছিটকে এসে পড়ল। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে যেন রীতিমত মড়ার পাহাড় হয়ে উঠল। আহতদের আর্তনাদ, যুধ্যমানদের পৈশাচিক চীৎকার আর গুলির শব্দ—সে যেন আমাদের নরক বাস।

কিন্তু স্বর্গের সন্ধানও একটু ছিল বৈকি।

লুসী এই সব কাণ্ড দেখে সোজাসুজি দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে। ওর দেহ ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল—সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছিল; ভয়ে এলিয়ে পড়েছিল। আমি অভয় স্বরূপ বাঁহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রইলুম—আর ডান হাতে ধরা রইল পিস্তল। গাঙ্গুলী মশাই, সেই আমার জীবনে প্রথম মা ছাড়া অন্য রমণীর স্পর্শ—সেই শেষ। সে আমার জীবনের অমৃতক্ষণ। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালে এসে লাগছিল। ওর মাথার সুগন্ধ চুল আমার মুখে চোখে এসে পড়ছিল, ওর বক্ষস্পন্দন আমার বুকে অনুভব করছিলুম। এত কোমল সে তনুলতা, ভয় হয় বোধ হয় যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে। চারিদিকে যে এত বীভৎসতা তবু আমার মনে হ'ল যে এ ক্ষণের স্বপ্ন তুলনা নেই। এ রাত্রি অনন্ত রাত্রিতে পরিণত হোক্। এ যুদ্ধ যদি সারা জীবন না থামে ত আপত্তি নেই!

সেই ভাবে বোধ হয় ঘণ্টা খানেক কাটল। সিপাইরা দলে ভারী ছিল বলে সহজেই সে যাত্রা গোরাদের হারিয়ে দিলে। তারপর চল্‌ল হৈ হৈ করতে করতে ওদের পিছু পিছু। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকবার পর একটু নিরাপদ মনে হ'ল। তখন আস্তে আস্তে ডাকলুম, মিসেস্ হলস্টোন এইবার যেতে হ'বে যে। সাড়া এলনা। তখন ওকে ঝাঁকানি দিয়ে দেখলুম লুসী মূর্ছা গেছে। উপায়? তখন আর ভাববার সময় ছিল না। পিস্তলটা কোমরে। দু হাতে ওকে বুকে তুলে নিলুম, তারপর বাইরে এসে ওকে বহন করেই রাস্তা চলতে শুরু করলুম। লুসীর দেহ খুব হাল্কা, কিন্তু ভারী হ'লেও বোধ হয় কষ্ট হ'ত না। তখন

রাস্তা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম ফরসা হ'তে খুব বেশী দেরি নেই। একটু জোরে পা চালিয়ে দিলুম কেন না ভোরের আগেই পৌছাতে হবে।

খানিকটা চলবার পরই সামনের দিক থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু তার দরকার ছিল না, দেখলুম চার পাঁচ জন ইংরেজ অফিসার ঘোড়ায় চড়ে এই দিকে আস্ছেন। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ওদের পথ জোড়া করে দাঁড়ালুম। একজন চট্ ক'রে একটা দেশলাই জ্বেলে ফেললে, আর এ কজন হ্যাল্লো ব'লে নেমে পড়ল। দেশলাইএর আলোয় চিনতে পারলুম হলস্টোন।

হলস্টোন বললেন, 'তোমাকেই খুঁজছিলুম মিত্তির, কিন্তু একি ?'

আমি বললুম, ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে মেমসাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, উপায় নেই দেখে আমি বয়ে আন্ছি—

হলস্টোন একবার ভ্রূকুটি ক'রে আমার দিকে চাইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে লুসীর অচৈতন্য দেহটা তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চাপালন। শুষ্ককণ্ঠে একটা ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'কাল সকালে ক্যাণ্টনমেণ্টে দেখা করো তোমার টাকা পাবে—'

হায়রে মানুষের ঈর্ষা! কত সামান্য কারণে ঈর্ষা আসে, সকল কৃতজ্ঞতা নষ্ট করে—তাই ভাবি। লুসীর একখানা হাত তখনও আমার গলা জড়ান ছিল!

•

আমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এক মিনিটে ফুরিয়ে গেল। আমি মাতালের মতো কোনওক্রমে বাসায় এসে শুয়ে পড়লুম। পরের

দিন টাকা আনতে যাইনি। বিকেলে হলস্টোন চাকর দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে টাকা দিলেন। ঐ পর্যন্ত, মুখ গম্ভীর ক'রে রইলেন!

তিন চার দিন পরে সন্ধ্যা বেলায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরুব ব'লে একটা নিরাপদ রাস্তা খুঁজছি এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, 'অসিত!'

চম্‌কে ফিরে দেখি, লুসী। ও আমাকে ইশারা করে ডেকে নিয়ে গেল একটা বড় গাছের তলায়। সেইখানে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল, সেইটে দেখিয়ে বল্‌লে, 'ব'সো।'

তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, তবুও আমি একবার চারিদিক চেয়ে বসলুম। ভেবেই পাচ্ছিলুম না এর অর্থ কি। লুসী সহসা একেবারে আমার কোলের উপর এসে বসে গলা থেকে এই সোনার হারটা খুলে ফেলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর অশ্রুজড়িত গলায় বললে, 'মিঃ হলস্টোন দু-তিন দিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। লুকিয়ে যাবেন, তখন আর দেখা হবে না বলে তোমায় খুঁজছিলুম অসিত, আমি যাচ্ছি বটে কিন্তু আবার ফিরে আসব তোমার কাছে।'

আমি কি উত্তর দেব? আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল।

লুসী বললে, 'আমায় কি তোমার কিছু বলবার নেই? একবার অন্ততঃ লুসী বলে ডাক আমায়।'

হায়রে, সে জানে না যে ঐ নামে ডাকবার জন্য আমার গলা আকুলি বিকুলি করছে। কম্পিত কণ্ঠে বললুম, লুসী, আমি তোমায় ভালবাসি, একথা বলবার কি অধিকার আমার আছে?

লুসী বললে, 'আছে। ও অধিকার সব সময়েই থাকে। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী অধিকার নিয়ে আমি ফিরে আসব তোমার কাছে অসিত, তুমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারবে ত ?'

আমি বললুম, লুসী মরণের দিন অবধি আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ডাক এল—'লুসী !'

লুসী ত্বরিৎপদে দাঁড়িয়ে বললে, 'চল্‌লাম বিদায়।'

তারপর যেন সেই আঁধারেই মিলিয়ে গেল।

গাঙ্গুলী মশাই, এই দেখুন সেই গলার হার। হয়ত সে বেঁচে নেই। হয়ত পালাতে গিয়ে পথে সিপাহীদের হাতে পড়েছে। হয়ত অন্ধ ঈর্ষায় হলস্টোনই তাকে খুন করেছে। এমনি মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবু আমি অপেক্ষা করব। সকলকে বলা আছে মরণের পরে আমাকে যেন সমাধি দেওয়া হয়, আর এই হার এমনই গলায় থাকে। আজও আমার অপেক্ষা করার শেষ হয় নি, মরণের পরও আমার সমাধি অপেক্ষা করবে, যদি লুসী ফিরে আসে !···

গাঙ্গুলী মশাইয়ের গল্প যখন শেষ হ'ল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

প্রাণের মূল্য

১২৬৪ বঙ্গাব্দের হেমন্তকাল—কার্তিকের শেষ। উত্তর ভারতে এই সময়টা দিনের বেলা যথেষ্ট শীত বোধ না হ'লেও সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস রীতিমত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম শীতের সে কামড় সাধারণ জামা-কাপড় ভেদ ক'রে যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে।

আমরা যে দিনের কথা বলছি, সেদিন দুপুরের পর থেকেই আকাশে মেঘ দেখা দিয়ে বিকেল নাগাদ গুঁড়ি গুঁড়ি জল হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ফলে ঠাণ্ডাটা যেন আরও জাঁকিয়ে পড়েছে, বেলা চারটের সময়ই চারিদিক ঝুপ্সি হয়ে নেমেছে অন্ধকার; যদিও মেঘটা মনে হচ্ছে এবার কেটেই যাবে, কারণ জল থামবার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়-কাঁপানো উত্তুরে বাতাস উঠেছে, এ হাওয়ার মুখে মেঘ বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না।

এরই মধ্যে একেবারে গোমতী নদীর জলের কিনারা দিয়ে একটি তরুণী মেয়ে যথাসাধ্য নিঃশব্দ অথচ দ্রুতপদে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর অপেক্ষাকৃত পাৎলা শাড়ীর ওপর আরও পাৎলা একটি সাদা ওড়না জড়ানো—তাও সম্ভবত কিছুক্ষণ আগেকার বৃষ্টিতে অনেক আগেই ভিজে গেছে—ফলে যে সামান্য বস্ত্রে শীত নিবারিত হওয়া ত দূরের কথা—আর্দ্রবস্ত্রে বাতাস লেগে তা শীতবৃদ্ধিরই কারণ হয়ে উঠছে।

এই সময় এই জনবিরল অংশে এই মেয়েটির আবির্ভাব একটু বিস্ময়কর বৈকি!

লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থা গত কয়েক মাস যাবতই বড় গোলমেলে হয়ে

রয়েছে। দেশী সিপাইরা বিদ্রোহ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। ইংরেজ মসীজীবী ও অসিজীবী দুইদলেরই লোক প্রাণভয়ে এসে রেসিডেন্সীর বাগানে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে তাদের উৎখাত করবার যে চেষ্টা চলেনি তা নয়—গত কয়েকমাস ধরে অহোরাত্রই সে চেষ্টা চলেছে বলতে গেলে—কিন্তু সুবিধে হয়নি বিশেষ, মুষ্টিমেয় ইংরেজ নারী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে জীবনরক্ষার জন্য যে অদ্ভুত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসে তা স্মরণীয়। ওদিকে এদের উদ্ধার করার জন্য ইংরেজদেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই, মধ্যে মধ্যে বেশ ভাল রকমই আশা জেগেছে এখানের অবরুদ্ধ এই ক'টি প্রাণীর মনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধা হয়নি। বার বার ফিরে যেতে হয়েছে উদ্ধারকামী দলকে। শত্রুর শৌর্যের কাছে না হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে হার মানতে হয়েছে শেষ অবধি।

কিন্তু এবারের হাওয়া অন্য রকম। দুর্ধর্ষ হাইল্যাণ্ডার বা স্কচ্ সৈন্যরা এসে পৌঁচেছে, তাদের সেনাপতিরূপে এসেছেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। বালাক্লাভা যুদ্ধের গৌরব-মুকুট এখনও তাঁর শিরে অম্লান। কোন শত্রুর কাছে মাথা নোয়াতে শেখেনি এই হাই-ল্যাণ্ডাররা—এখানকার সিপাহীরা এদের গতি রোধ করতে পারবে, সে আশা খুবই কম।

আমরা যেদিনের কথা বলছি সেদিন সিপাহীদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ঐ কারণেই।

হাইল্যাণ্ডাররা একেবারে শহরের উপকণ্ঠে বসে পড়েছে। আলমবাগ পর্যন্ত পৌঁচেছে তারা। আজই নাকি দুপুরে জালালাবাদের মাটির কেল্লাও তাদের পদানত হয়েছে—অভ্রভেদী দুর্গপ্রাকার মাটিতে

এসে মিশেছে। কেল্লা বিজয়ের পর আবার তারা আলমবাগে ফিরে গেছে বটে কিন্তু এমন অবস্থাই ক'রে রেখে গেছে যে, সে কেল্লা দখল ক'রে সিপাইদের আর কোন লাভ হবে না, এতটুকু আশ্রয় বা আড়াল আর সেখানে অবশিষ্ট নেই।

সংবাদটা যথাসময়েই শহরে এসে পৌঁচেছে। থমথম করছে সিপাহীদের শিবির। আরও উগ্র হয়ে উঠেছে বিদ্বেষ। যদি কোনমতে এখনও ঐ রেসিডেন্সীর ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়াল থেকে ঐ ক'টা ইংরেজের মুর্দাকে টেনে এনে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেত! ঐ ক'টা প্রাণের জন্যেই ত এদের এত জেদ, এত আগ্রহ!

অবশ্য এটাও ঠিক যে সিপাহীদের আনাগোনা ছাড়া লক্ষ্ণৌতে আর কোন প্রাণলক্ষণই যেন নেই। অধিকাংশ নাগরিক—যাদের একটু অবস্থা ভাল অথবা দেহাতে কিছুমাত্র আশ্রয় আছে—তারাই ঘরবাড়ীতে তালা দিয়ে দূর গ্রামে কোথাও পালিয়েছে। যারা একান্ত যেতে পারেনি, তারা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে যতদূর সম্ভব অস্তিত্বের প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ বাইরের দোরে ভারি তালা লাগিয়ে পিছনের দোর দিয়ে ঢুকেছে বাড়ীর মধ্যে! রাস্তার দিকের ঘরে সাধ্যমত আলো জ্বালায় না কেউ। কেন? তা অবশ্য কেউ জানেনা, কিসের একটা আতঙ্ক সকলকেই যেন শশকবৃত্তি অবলম্বন করিয়েছে। কোনমতে মুখটা লুকিয়ে রেখে সবাই নিজেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করছে! এমন কি লুটেরা বদমাইসের দল—যারা এই শ্রেণীর হাঙ্গামা বা বিপ্লবেরই পথ চেয়ে কাল গোণে, তারাও যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে চলাফেরাটা পরিহার ক'রে চলেছে।

সুযোগের অপেক্ষায় ইঁদুরের মত কোন আড়ালে-আবডালে আত্ম-গোপন ক'রে ওৎ পেতে বসে আছে।

এহেন দুঃসময়ে এবং অরাজক অবস্থায় তরুণী মেয়ের পক্ষে ঘরের বার হওয়াই যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ, তার ওপর এই রকম স্থানে আসাটা খুবই অসমসাহসিকতা বলতে হবে। যেখানে আশে-পাশে চারিদিকেই সিপাহীদের ঘাঁটি—তারা হয়ত সবাই রক্তপিপাসু নয় কিন্তু—নারী-বুভুক্ষু প্রায় সব ক-জনই। এবং সে কথাটা হিন্দু-স্থানের কোনও মেয়েরই আজ না জানবার কথা নয়!···

মেয়েটি অবশ্য এই সব বিপদ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত নয়। কারণ সম্ভবত সেই সম্ভাবনা এড়াবার জন্যই, সে একেবারে জলের কিনারা দিয়ে যাচ্ছিল, উঁচু পাড়ের আড়ালে আড়ালে। এবং তৎসত্ত্বেও ঘন ঘন ওপরের রাস্তাটার দিকে, বিশেষত নদীর অপর পাড়ে, সভয়ে তাকাচ্ছিল! তবে বর্ষার জন্যই হোক্ আর এই দুর্দান্ত উত্তুরে বাতাসের জন্যই হোক্—এদিকটা আপাতত একেবারেই জনবিরল। ক্বচিৎ দু'একটা কুকুর এবং খরগোশ ভিন্ন অপর কোন প্রাণীও তার নজরে পড়ল না।

কৈসারবাগের কাছাকাছি এসে মেয়েটি কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। নিজের কাঁকলির মধ্য থেকে একটি পুরোনো আমের আঁটি বার করলে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেভাবে আমের আঁটিকে ভেঁপুতে রূপান্তরিত করে—কতকটা সেই রকমই সেটার চেহারা। মেয়েটি এদিক ওদিক আরও বারকয়েক ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে একটা কাশ ঝোপের আড়ালে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন ক'রে অকস্মাৎ সেই আম-আঁটির ভেঁপুতে চারটে ফুঁ দিলে,পর পর—দ্রুত। দু'বার খুব

টানা, একবার সামান্য একটু, আবার একটা টানা—অর্থাৎ রীতিমত কোন সঙ্কেত।

শব্দটা ক'রেই যতটা সম্ভব একটা কাশ ঝোপের মধ্যে মাথা লুকিয়ে মেয়েটি দুরু দুরু বক্ষে কার অপেক্ষা করতে লাগল।

বাঁশীতে সঙ্কেত জানাবার সময় মেয়েটি দুদিকের নদীতীর যতটা জনহীন ভেবেছিল—ততটা কিন্তু সত্যিই নয়। সে ডাক, যাকে ডাকা হয়েছিল সে ছাড়াও, আরও কয়েকজনের কানে পৌঁছল। তার মধ্যে দুজন সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিজাতীয়—কর্পোরাল বিল মিচেল আর সার্জেণ্ট জন প্যাটন।

ক্যাভানাঘ নামে একজন ইউরোপীয় কেরাণী এবং কনৌজীলাল মিশির নামে আর একটি হিন্দু সিপাহী মাত্র দুদিন আগেই রেসিডেন্সী থেকে বেরিয়ে বিচিত্র ও বিপজ্জনক পথে স্যার কলিনের শিবিরে এসে পৌঁছেছে। তাদের কাছে পাওয়া গেছে লক্ষ্ণৌ প্রবেশের নিরাপদ পথের সন্ধান, আর তার সঙ্গে শত্রু-শিবিরের অনেক রহস্য। তার ফলে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে, সকলেই এই দুটি লোককে দেখতে উৎসুক, সবাই এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সেই প্রশংসা শিবিরের বহু তরুণের প্রাণেই নতুন নেশা ধরিয়েছে। সকলেই নতুন-কিছু করার জন্য, জাতির এবং মহারাণীর কোন কাজে লাগার জন্য উৎসুক। জীবন বিপন্ন ক'রে জীবনের মুল্য বাড়াতে চায় সকলেই। এমন একটা কিছু করতে চায়—যাতে ভিক্টোরিয়া ক্রশ যদি না-ও জোটে ত অন্তত সেনাপতি ও সহকর্মীদের প্রশংসা ও ঈর্ষা লাভ করতে পারে!

সেই নেশাই আজ এই দুটি তরুণকে এই বিপদ ও শত্রুসঙ্কুল এলাকায় টেনে এনেছে। তারা বিশ্রামের দুর্লভ অবসর উপেক্ষা ক'রে সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়েছে, নতুন কোন খবর তাদের সেনাপতির জন্য সংগ্রহ করতে পারে কিনা, নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে পারে কিনা, এই আশায়। একটা কিছু করতেই হবে—সাধারণ আর পাঁচজনের থেকে পৃথক কিছু। অসাধারণ কিছু!

পথে বেরিয়ে পড়েছে ঝোঁকের মাথায় কিন্তু তাই ব'লে পথের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় ওরা, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। অথবা বিপদ তুচ্ছ করেছে ব'লে প্রাণটাও তুচ্ছ করবে—এত নির্বোধও ওরা নয়। ওরাও অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে চলছিল, এবং সকলের দৃষ্টি এড়াবার জন্য নদীতীর ধরে—জলের কিনারা দিয়েই চলছিল। নিজেদের আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে কাশঝোপ ও অসমান পাড়ের আড়ালে আড়ালে চলছিল বলে, ওরা ওদের অগ্রবর্তিনীকে লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ, এখন অকস্মাৎ অনতিদূরে ভেঁপুর এই সুনিশ্চিত সঙ্কেতে চম্‌কে উঠে, সভয়ে একটা বড় কাশঝোপের আড়ালে বসে পড়ল দুজনেই। ভয়ে দুজনেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—সেই কন্‌কনে শীতেও কপালে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

সঙ্কেত—তাতে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু কিসের?

তবে কি ওদেরই উপস্থিতি কেউ টের পেয়েছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে?

মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়ালে কেমন মনোভাব হয়, তার আস্বাদ পায় এই দুটি স্কচ্ যুবক!

প্যাটন পিস্তলটা আরও জোরে মুঠো ক'রে ধরে অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়ে ওঠে—

সঙ্গে সঙ্গে বিল মিচেল তার মুখের ওপর নিজের বাঁ হাতটা চেপে ধরে।

স্তব্ধ শান্ত এই আবহাওয়ায় সামান্য শব্দও বহুদূর যায়।

প্রথম ভয়ের মুহূর্ত ক-টা কেটে যেতে আবার নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এল। এইবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুজনেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে। বেশী ক'রে ঘাড় ঘুরোতেও যেন ভরসা হয় না। পাছে সামান্য একটু শব্দও হয়—কিংবা ওদের অবস্থিতি কারুর চোখে পড়ে।

ঝাপ্‌সা মেঘমেদুর অপরাহ্ন। পাৎলা কুয়াশার একটা আ... বণ এরই মধ্যে নেমে এসেছে গোমতীর জলে। বেশী দূর সেই ...পষ্ট আলোতে নজরও চলে না। তবু চোখ অভ্যস্ত হ'তে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে দেখতে পেলে—এবং বিস্ময়ে দুজনেই সামান্য একটা শব্দ ক'রে উঠল। নিজেরা সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সতর্ক হবার আগেই শব্দটা বেরিয়ে গেল গলা দিয়ে।

তাদের ঝোপটা থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেই আর একটা ...প আড়ালে, প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে তাদেরই মত আত্মগোপন ...ছে আর একটি প্রাণী। মেয়েছেলে একটি—এবং সম্ভবত

...ভ্‌!' প্যাটন ব'লে উঠল—প্রায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে

বলে উঠল বিল, 'এ গ্যাল্‌!'

মেয়েটি সে শব্দ শুনতে পেলে না। সে এদিকে ফেরেও নি। এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল তার সামনের দিকে। অর্থাৎ সেই দিক থেকে কাউকে আশা করছে সে।

আরও একবার একটা আশঙ্কার হাওয়া যেন ওদের মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। মেয়েটা ভারতীয়—সুতরাং ওদের শত্রু। সে-ই ওদের উপস্থিতি জানতে পেরে সংকেতে জানিয়ে দিলে না ত কাউকে ? এবং পাছে ওরা সেটা সন্দেহ করে—তাই কিছুতে এদিকে তাকাচ্ছে না ?

শুকনো আড়ষ্ট জিভটা প্যাটন তার আরও শুষ্ক ঠোঁট দুটোর আতঙ্কে ... নিলে একবার।

পারন্তু বেশিক্ষণ তাদের এ সংশয়ের মধ্যে থাকতে হ'ল না। ...রও একটু দূর সামনে থেকে অস্পষ্ট একটা আহ্বান কানে এল—গঙ্গু ?'

চাপা গলায়—প্রায় ফিসফিসিয়ে মেয়েটা উত্তর দিলে, 'মোহন ভাইয়া ?'

ওদেরই মত ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে, ত্বরিৎ অথচ নিঃশব্দ পা এগিয়ে এল একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা। সিপাহী সাধারণ নাগরিকের বেশ ওর পরণে—ধুতি ও কুর্তা। পায়ে নেই, সম্ভবত শব্দ হবার ভয়েই তা ছেড়ে এসেছে কোথা... জুতো পরবার অভ্যাস আছে তা বোঝা যায়—কার... জায়গাটুকু আসতে আসতেই দুবার হেঁট হয়ে পা... কাঁকর কী ছাড়ালে ছোকরা !

মোহন কাছে আসতেই গঙ্গু সব সতর্কতা ভু...

সাগ্রহে এগিয়েও গেল খানিকটা। মোহনও এবার বেশ একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই চলে এল বাকী পথটা, তারপর দুজনে দাঁড়িয়ে দ্রুত অথচ নিম্নকণ্ঠে কথা কইতে লাগল।

কী কথা তা শোনা গেল না এতদূর থেকে। মৃদু গুঞ্জনের বেশী শব্দ উঠছিল না। শুধু ওদের দ্রুত ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কথাটা দুজনেই একটু তাড়াতাড়ি সারতে চাইছে। ওরা যে খুব নিরাপদ নয় সে সম্বন্ধে-প্রত্যক্ষ কোন কারণ কাছাকাছি না থাকলেও দুজনেই খুব সচেতন। কারণ দুজনেই সভয়ে বার বার চারদিকে তাকাচ্ছিল।

মোহন কথা কইতে কইতেই কুর্তার সামনের দিক৮া কোমরে-জড়ানো কোঁচার খাঁজ থেকে একটা কি বার ক্‌লো ... গঙ্গুর প্রসারিত হাতে পড়তে বোঝা গেল—কয়েকটা টাকা। ... কম নয় অন্তত পনোরাটা টাকা ত বটেই।

টাকাটা নিয়ে গঙ্গু তার শাড়ীর আঁচলে বাঁধতে যাবে—এমন সম্‌... ...ক অঘটন ঘটল। এবং সে ঘটনায় শুধু ঐ দুটি তরুণ-তরুণীই নয় ...া দুজনও রীতিমত চমকে উঠ্‌ল।

ঘটনাটা যেমন অভাবনীয়, তেমনি অকল্পিত।

...ঝা গেল যে এরা ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ আর একজন কাছেই

উঁচু রাস্তা থেকে, ঢালু পাড় বেয়ে মোহন ও গঙ্গুর ওপর ...য়ে পড়ল আর একটি স্কচ্‌ সৈনিক। প্যাটন ও বিল ... পারলে—দুজনেই প্রায় একসঙ্গে অস্ফুট-কণ্ঠে ব'লে

বোঝা গেল যে ওদের মতই স্মিথও বেরিয়ে পড়েছে—একই উচ্চাশার তাড়নায়। সে সম্ভবত সাহস ক'রে ওপরের রাস্তা ধরেই এসেছে—এবং গঙ্গার ভেঁপুর আওয়াজ না পেলে নদীর কিনারায় নামবার কথা তার মনেই হ'তনা। সে ঐ শব্দ পেয়েই হয়ত এতক্ষণ ওপরের কোন গাছের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে, এখন সুযোগ পেয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই দুটি ভয়ার্ত নরনারীর ওপর।

স্মিথের গলা দিয়ে এমন একটা চাপা অথচ হিংস্র উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এসেছিল যে তাইতেই এরা দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে উঠল এদের মুখ! পালাবার চেষ্টাও করতে পারলে না—সাপের উদ্যত ফণার দিকে চেয়ে মানুষ যেমন অনড়, জড় হয়ে যায়, মৃত্যু আসন্ন বুঝেও নড়তে পারে না—তেমনি ভাবেই এরা দুজন এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের দিকে চেয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অবশ্য সে সময়টাও কয়েকটি নিমেষকালের বেশী নয়।

স্মিথ পিস্তলের ওপর ভরসা ক'রে বেরোয়নি—রীতিমত রাইফ্‌ল্ নিয়েই বেরিয়েছে এবং সেটা হাতেই ধরা ছিল। বিদ্যুৎগতিতে নেমে এসে সোজা বেয়নেটটা মোহনের বুকে লাগিয়ে ধরে আর একবার তেমনি চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। নির্জন নিস্তব্ধ নদীপ্রান্তরে সে শব্দটা এমনই পৈশাচিক ব'লে মনে হ'ল যে—গঙ্গু একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুকটা শুধু বাঁ-হাতে বদলে নিয়ে ডান হাতে গঙ্গুর একখানা হাত একেবারে মুচ্‌কে ধরে উগ্র কণ্ঠে ব'লে উঠল, 'চুপ রহো কুত্তি—চুপ! নেহি ত—'

গঙ্গু যন্ত্রণায় একটা অব্যক্ত আর্তনাদ ক'রে উঠল বটে—কিন্তু সম্ভবত ভয়েই—তার কান্না থেমে গেল।

জন আর বিল—দুজনেরই বিস্ময়ের প্রথম বিহ্বলতা ততক্ষণে কেটে গেছে। এবার তারা এক লাফে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'এনাফ্, স্মিথ, ছেড়ে দাও!' বিল স্মিথের হাতটায় মৃদু টান দিয়ে বললে।

'ছেড়ে দেব। ইস! বড় যে সোহাগ দেখছি।' কণ্ঠে কটু বিদ্রূপের সুর স্মিথের—'এ বদমাসটা নিশ্চয়ই সিপাহীদের লোক—আর মেয়েটা গুপ্তচর। মেয়েটার কাছ থেকে টাকা দিয়ে খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা।...এদের ছাড়ব? আগে কি খবর জানব, তারপর লোকটাকে বেয়নেট করব মেয়েটার সামনে—'

এদের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমটা মোহন আর গঙ্গু দুজনেই ভেবেছিল—এরাও স্মিথের দলের লোক। যমদূতের সহচর যমদূত! একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! ভেবে জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু এখন ইংরেজী কথার অর্থ না বুঝলেও—মিচেলের হাতের ভঙ্গীতে এবং কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির আভাস পেতে দেরী হ'ল না। গঙ্গু এক হাতেই মিচেলের একটা হাত জড়িয়ে ধরল, 'বাঁচান, বাঁচান মালিক। এবারের মত ছেড়ে দিন!'

হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগল সে। বুকফাটা কান্না।

জন প্যাটন এগিয়ে এসে একটু যেন জোর ক'রেই স্মিথের বন্দুক-সুদ্ধ হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা শোনাই যাক্ না এদের

কি বলবার আছে। ওরা নিরস্ত্র, এখানে আমরা তিনজন হাতিয়ার সুদ্ধ লোক, পালাবে কোথায় ?'

স্মিথ ক্রুদ্ধভাবে একটা চাপা গর্জন ক'রে বললে, 'ছাখো, তোমরা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এটা তোমাদের সম্পূর্ণ অকারণ নাক-গলানো, অনধিকার-চর্চা।…এরা আমার ভাগে, আমিই এদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করব! তোমরা তোমাদের পথে যাও—'

বিল মিচেল ততক্ষণে গঙ্গুর হাতখানা স্মিথের থাবা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বেচারীর সুগৌর কোমল হাতে নীলাভ কালশিরা পড়ে গেছে ঐটুকুর মধ্যেই! রক্ত জমে ফুলেও উঠেছে খানিকটা।

স্মিথ, প্যাটনকে ছেড়ে মিচেলের দিকে ফিরল। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর-কণ্ঠে বললে—'তার মানে ? এর মানে কি ?'

অবিচলিত ভাবে মিচেল বললে, 'পথের মাঝে অসহায় মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবার জন্যে আমরা হাতিয়ার ধরিনি স্মিথ— অত্যাচার থেকে বাঁচাতেই ধরেছি!'

'উঃ! বড্ড যে দরদ দেখছি!…দিব্যি মাল—য়্যাঁ? তা বাপু আমরাও ভোগ করতে জানি!' স্মিথের মুখখানা খেঁকি কুকুরের মত বিকৃত হয়ে উঠল।

'না, আমাদের রুচিটা ঠিক অত নিচে নামেনি সার্জেণ্ট স্মিথ। আমাদের প্রয়োজনও এত জরুরী নয়!'

'তবে কি নিছক দয়া?…বলি, এরা আমাদের মেয়েছেলেদের ওপর এতটা দয়া করেছিল কি? কানপুরে?'

'তুমি কি আমাদেরও ঐ ওদেরই স্তরে নেমে আসতে বলো?

বাগে পেয়ে যদি আমরাও ওদের মত পাশবিক আচরণ করি ত ওদের দোষ দেব কোন্ অধিকারে ?···এনাফ্, যথেষ্ট হয়েছে।'

মিচেল আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই গঙ্গুর দিকে ফিরে উগ্রকণ্ঠে বললে, 'তোমরা এখানে কী করছিলে ? এর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিলে কেন ? তোমরা থাকো কোথায় ?'

মিচেল ক-মাসের মধ্যেই মোটামুটি উর্দ্দু আর হিন্দী রপ্ত করে নিয়েছিল।

গঙ্গু এবার একেবারে মিচেলের পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর দুই পা জড়িয়ে ধরলে, 'সাহেব, তুমি আমার মা-বাপ, তোমার কাছে মিছে কথা বলব না। এ আমার ভগ্নিপতি। শহরেই থাকতুম আমরা, হাঙ্গামার ভয়ে দেহাতে গিয়ে আছি, এদের বাড়ীতেই! আমার বোনের খুব অসুখ, খেতি-উতির কাজ ত বন্ধ, গেঁহু বাজরা কিছুই বিক্রী হচ্ছে না, মাল বার করারই উপায় নেই। তার ওপর, যা ছিল গত মাসে সিপাইরা জোর ক'রে নিয়ে গেছে, দামও দেয়নি। টাকা না পেলে চলবে না। তাই অনেক কষ্ট ক'রে ভয়ে ভয়ে এখানে আসি—এই মোহন ভাইয়া কিছু কিছু টাকা জোগাড় ক'রে দেয়। হপ্তায় এই মঙ্গলবার ঠিক করা আছে, এইখানে এসে আমি ইসারা করি। সব দিন মোহন ভাইয়া আসতে পারে না, এত কষ্ট ক'রে আসা—তাও ফিরে যেতে হয়। আবার সাত দিন পরে। গত হপ্তায় ফিরে গেছি—ঘরে কিছু নেই, আজ দেখা না পেলে সাত দিন উপোস করতে হ'ত।'

'তোমাদের আর কেউ নেই ?' মিচেলই প্রশ্ন করে। প্যাটন হিন্দী বোঝে কিন্তু ভাল বলতে পারে না।

'আমার ভেইয়া ছিল। সে ফৌজেই কাজ করত, আজ তিন মাস তার কোন পাত্তা নেই। বোধ হয় মরেই গেছে—'

আবারও হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে গঙ্গু।

'তুমি কি করো?' মিচেল মোহনকে প্রশ্ন করে এবার, 'তুমিও কি সিপাই?'

'আমার একটা ছোট্ট দোকান ছিল হুজুর। চার মাস আগে লুঠ হয়ে যায়। বেকার বসেছিলাম, সিপাইরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের বাজার করা, রসুই করা—এই সব করিয়ে নেয়। এক কথায় ওদের নৌকরী করি।'

'মাইনে দেয়?'

'কে দেবে সাহেব? ওদের আছে কি? বেগমের তহ্‌বিলে আর এক পয়সাও নেই।'

'তবে এ টাকা কোথা থেকে পেলে?'

'ওরা লুঠতরাজ ক'রে আনে। আমি ওদের টাকা চুরি করি। বাজার করতে দেয়, তা থেকে সরিয়ে রাখি এক আধ টাকা। নইলে বাঁচব কেমন করে সাহেব? মা আছে, জরু আছে, এরা আছে— এদের দেব কি?

'তুমি ঠিক বলছ? সচ্‌?'

'ভগবানের কশম বাবুজী, গঙ্গামায়ী কশম। যদি মিছে বলি ত জিভ্‌ আমার খসে যাবে!'

'তারপর? তোমাকে যদি ছেড়ে দিই—ত এখনই গিয়ে সিপাহীদের খবর দেবে ত? আমাদের ধরিয়ে দিলে তোমাদের বেগম আর মৌলবী অনেক টাকা ইনাম দেবে!'

'সে টাকা ছোঁবার আগে এই গোমতীতে ডুবে মরতে পারবে সাহেব—সে টাকা আমার গোমাংস !'

মিচেল ফিরে দাঁড়িয়ে প্যাটনকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলে, 'ওদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে। কী বলো সার্জেণ্ট প্যাটন ?'

'কখনও না —' সার্জেণ্ট স্মিথ আবারও চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। অনেকক্ষণের নিরুদ্ধ বহ্নি ওর দৃষ্টি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন। বললে, 'এরা সবাই মিথ্যেবাদী। মিথ্যেবাদীর জাত। এই নেটিভদের মত মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এদের ছেড়ে দেওয়া চলতেই পারে না। আগে ঐ ছোঁড়াটাকে মারব—তারপর ঐ মেয়েটাকে দেখব !'

'ছিঃ স্মিথ ! আমরা হাইল্যাণ্ডার যুদ্ধ ব্যবসায়ী, কসাই নই'! তাছাড়া এরা কেউই সিপাই নয়। সিপাইরা আমাদের শত্রু !'

'কি ক'রে জানলে সিপাই নয় ? ও যে আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই পোশাক খুলে রেখে আসেনি তার প্রমাণ কি ?··· তাছাড়া ভারতীয় মাত্রেই এখন আমাদের শত্রু। আর অত কথারই বা কি আছে। আমি ওদের প্রথম ধরেছি, আমারই অধিকার। আমি ছাড়ব না !'

ঘাড় গোঁজ ক'রে বলে স্মিথ।

বিল মিচেলের নীল চোখে অদ্ভুত একটা ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয় ! সে দীপ্তি—তার পাশে দাঁড়িয়ে যারা লড়াই করেছে—তারা অনেকবার দেখেছে ! যারা জানে তাকে, তারা এটাও জানে, এ চাহনি পৃথিবীর কাউকেই, কিছুকেই পরোয়া করেনা।

সে সোজা মোহন আর গঙ্গুর দিকে ফিরে বললে, 'যাও তোমরা, পালাও! এবারের মত ছেড়ে দিলাম। আশা করছি আজ যে দয়া পেলে—এ দয়া তোমরা অপরকেও দেখাবে!'

'কখনও না! স্টপ্!' বাঘের মত লাফিয়ে ওঠে স্মিথ। বোধহয় মুহূর্তের মধ্যেই বেয়নেটটা বসিয়ে দিত মোহনের পাঁজরে, কিন্তু সে বন্দুক তোলার আগেই—চোখের পলক পড়তে না পড়তে বিল মিচেল আর জন প্যাটন দুদিক থেকে পিস্তলের নল দুটো ওর বুকে এবং পিঠে চেপে ধরলে। বিল মিচেল এবার রীতিমত উগ্র কণ্ঠেই বললে, 'হাত নামাও সার্জেণ্ট স্মিথ! আমি এদের প্রাণ দিয়েছি, আমার সামনে তা তুমি নিতে পারবেনা!'

স্মিথ আবারও তেমনি খেঁকি কুকুরের মত মুখ ক'রে বললে, 'আমি কিন্তু ওপরও'লাদের কাছে রিপোর্ট করব কর্পোরাল ফরবেস মিচেল!',

'স্বচ্ছন্দে। আমি সুখীই হবো তাহ'লে। নইলে আমার হয়ত তাঁদের কাছে জানাতে সঙ্কোচ হ'ত—তোমার আচরণের কথা!'

ততক্ষণে—ব্যাপারটা চোখের নিমেষে অনুমান ক'রে নিয়ে মোহন এবং গঙ্গু ছুটতে শুরু করেছে। কে জানে মত বদলাতে কতক্ষণ! অথবা যদি ঐ যমদূতটাই জিতে যায় শেষ পর্যন্ত?

ছুট ছুট। খানাখন্দ ডিঙিয়ে, মাটি পাথরে আছাড় খেয়ে, কুশ ও কাশঝোপের আড়ালে আড়ালে, ওরা দেখতে দেখতে চোখের বাইরে চলে গেল। গঙ্গুর পা কেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল, কাঁটাঝোপে ওড়না গেল ছিঁড়ে, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু

জ্রক্ষেপ নেই। পা থেকে কাঁটা ছাড়াবার জন্যও দাঁড়ালনা ওরা। একটা দুর্নিবার আতঙ্ক—প্রবল একটা প্রাণের ভয় বহুক্ষণ অবধি ওদের অকারণেই ছুটিয়ে নিয়ে চলল। শত্রুরা ওদের চোখের আড়ালে চলে গেছে কিনা—তা দেখবার জন্যও একবার থামল না ওরা! অনেক, অনেকক্ষণ পরে থামল দুজন। গোমতী ওদের অনেক পিছনে পড়ে—বহুদূর পিছনে সিকান্দার বাগ, কদম-রসুল ছত্তরমঞ্জিল! লোকালয় থেকেও দূরে চলে এসেছে। সামনে অবারিত চাষের মাঠ, দূর দিগন্তে ছায়ার মত গ্রামের চিহ্ন। সুনিবিড় শান্তির ও আশ্বাসের স্বপ্ন সেখানে—সেখানে সুপ্তি আর বিশ্রাম।

দুজনেই এবার ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল। এতক্ষণ যে আতঙ্ক ওদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল সে আতঙ্ক দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেল—ধপ্ ক'রে মাটিতে বসে পড়ল ওরা। এবং কিছুক্ষণ দুজনের কারুরই কথা কইবার শক্তি রইল না। চোখ বুঝে হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিতে লাগল শুধু।

বহুক্ষণ পরে মোহনই কথা কইল। বললে, গঙ্গু বহন, এবার আমি যাই? এতক্ষণ ছাউনির বাইরে আছি, হৈ-চৈ পড়ে গেছে হয়ত!'

.'যাও ভেইয়া। কিন্তু—'

কেমন এক রকম উৎসুক মুখ ক'রে তাকায় গঙ্গু।

'কিন্তু কি? বলো—!'

'না—বলছিলুম ঐ যমদূতটা ওদের কোন অনিষ্ট করবেনা ত? বিশেষত ঐ যে ঢ্যাঙ্গা ছেলেমানুষ ছেলেটি, যে হিন্দুস্থানীতে কথা কইছিল—ওর ওপর বড্ড রাগ লোকটার। তুমি, তুমি একটু নজর রাখবে ভেইয়া?'

মোহন হাসল। বলল, 'খুবসুরৎ জোয়ান সাহেব—বড্ড মায়া পড়ে গেছে, না বহন?'

'যাও! প্রাণ দিলে আমাদের, সে কৃতজ্ঞতা নেই? ওর জন্যেই বেঁচে চলে আসতে পেরেছ। আর আমার প্রাণের চেয়েও বেশী—ইজ্জৎই চলে যেত হয়ত।'

'তা ঠিক।' নিমেষে গম্ভীর হয়ে ওঠে মোহন, 'আমি এমনি তামাসা করছিলুম। কিন্তু বোন—আমরা ওদের দুশমণ, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। খবর নিতে গেলে কাছাকাছি যেতে হয়—আর কাছাকাছি গেলে—বুঝতেই পারছ। সবাই তোমার এই সাহেবের মত নয়। ওদের কোন কাজে আসবার আগেই আমার কম্ম যাবে নিকেশ হয়ে—।'

সেই সুদূরতম সম্ভাবনার ইঙ্গিতেই শিউরে ওঠে গঙ্গু, মোহনের একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'না না—তাহ'লে কাজ নেই। কিন্তু যদি তেমন কোন সুযোগ আসে, ওদের কোন উপকারে লাগতে পারো—তাহ'লে ত—?'

'নিশ্চয়। আমি কি মানুষ নই?'

ক্লান্ত শিথিল পা টেনে টেনে তোলে গঙ্গু। বলে, 'যাই এবার। এখনও কম ক'রেও তিন কোশ রাস্তা হাঁটতে হবে। কখন পৌঁছব কে জানে। আরও খানিকটা উজিয়ে এসে পড়লাম ত! পথ বেড়ে গেল।...ওরা হয়ত এখনই ভাবছে!'

'যেতে পারবে ত? পথ চিনতে পারবে? না সঙ্গে যাবো একটু?'

'না না। তাহ'লে আর তোমার নোকরি থাকবে না। সে

না থাকলেও ক্ষতি না—কিন্তু, হয়ত দুশমন মনে ক'রে ধরে এনে ফাঁসি দেবে। তুমি যাও, আমি যখন হোক পৌঁছব।'

দুজনে দুদিকের পথ ধরল। গঙ্গুর দেহ টল্‌ছে তখনও শ্রান্তিতে। তবু, যেতেই হবে।

১৬ই নভেম্বর ১৮৫৭। বিল মিচেলের জীবনে স্মরণীয় দিন বৈকি!

পর পর দুটো দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। আগের দিন সেকেন্দার বাগের যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার সিপাহী প্রাণ হারিয়েছে বটে—ইংরেজ পক্ষেরও খুব কম ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া ক-দিন বেচারীদের কাপড়-জামা বদলানো ত দূরের কথা—একটু মুখে-হাতে জল দেবারই অবসর হয়নি। কিন্তু তবু স্যার কলিন বিশ্রাম নিলেন না—নিতে দিলেনও না। ষোল তারিখ ভোরেই শাহ-নজফ আক্রমণ করলেন। শাহ-নজফ কেল্লা নয় ছাউনি ত নয়ই। অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাবের সমাধি। কিন্তু আপাতত এই সমাধি ও পাশের কদম-রসুল মসজিদ—দুই-ই সিপাহীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ ক'রে সিকান্দার বাগের পতনের পর সেদিন রাত্রে এইখানেই তারা সমস্ত শক্তি সংহত করেছে!

শাহ-নজফ দখল করা যতটা শক্ত হবে ভেবেছিলেন স্যার কলিন, কার্যত দেখা গেল তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত। আশপাশের আরও বহু ইমারৎ শত্রুদের দখলে। সেখানে তারা অনেকটা নিরাপদ, দেওয়ালের আড়ালে। তারা বাইরের মাঠে শত্রুদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিন্তু এরা দেখতে পাচ্ছে না। তারা শুধু কামান বন্দুক

নয়—তীরধনুকও চালাচ্ছে, তার সঙ্গে আছে জলন্ত মশাল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে তীরের ফলকে জড়িয়ে ছুঁড়ছে। সে সব বাড়ীর পাঁচীল বেয়ে উঠতে গেলে গরম ফুটন্ত তেল ঢেলে দিচ্ছে। এক কথায় তাদের জোর বেশী। শুধু তীর-ধনুকেই কত লোক মারা গেল তার ইয়ত্তা নেই! এরা ত অবাক! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেউ তীরধনুক নিয়ে লড়াই করে, তা এদের জানা ছিল না। ফলে বারবার এরা প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করছে—কিন্তু বারবারই পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। বহু সৈন্য মরছে, বহু অভিজ্ঞ সেনানায়কও। চিন্তায় স্যার কলিনের ললাটে গভীর রেখা ফুটে উঠেছে। বার বার তিনি রুমাল বার ক'রে ললাটের ঘাম মুছছেন, এবং উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকাচ্ছেন চারিদিকে।

সার্জেণ্ট জন প্যাটনের নানা কারণে মন খারাপ। আজই ও ভোরে—প্রাতঃরাশ খাবার সময় তার গ্রামের একটি ছেলে হঠাৎ বলে বসল, 'কে জানে—এই খাওয়াই হয়ত আমাদের অনেকের শেষ খাওয়া! ··যদি আমার কিছু হয় ত—সার্জেণ্ট, দয়া ক'রে আমার মাকে একটা খবর দিও!'

তখন অতটা গুরুত্ব তারা কেউই ছায়নি ছোকরার কথায়। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে, প্যাটনেরই চোখের সাম্নে একটা গোলা এসে ফাট্‌ল ছেলেটির ঠিক পাশেই। খানিকটা জ্বলন্ত লোহার টুকরো লেগে পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। একটা কথা কইবারও অবকাশ পেলে না ছেলেটা। মোটে আঠারো বছর বয়স, মায়ের এক ছেলে। কী বলবে ওর মাকে, কি করে খবর দেবে সে?

তারপর, ওর গাঁয়ের আর একটি ছেলের—একটা পা গেল উড়ে।

বেচারীর সেই কাটা উরু দিয়ে জলপ্রপাতের মত রক্ত পড়তে লাগল। ছেলেটা আর্তনাদ করলে না, অনুযোগ করলে না—সেইখানে বসে পড়ে ম্লান হেসে শুধু বললে, 'ভাই সব—মনে রেখো কানপুর। এগিয়ে যাও!' তারপরই, কোন লোক এগিয়ে এসে ওর ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার বা কোনরকম সাহায্য করার আগেই তার প্রাণহীন দেহটা এলিয়ে পড়ল ওদের চোখের সামনে।··প্যাটনের সে দিকে মন দেবার অবসর ছিল না, এগিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার ফিরে দেখলে—তখনও ম্লান হাসিটুকু তার মুখে লেগে রয়েছে, মৃত্যু এতটুকুও মুছে দিতে পারেনি সে হাসির।

কিন্তু এতেই শেষ নয়—ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন—এইমাত্র—সুদ্ধ নিজের নির্বুদ্ধিতায় প্রাণ হারাল! ওরা একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়াল থেকে যুদ্ধ করছিল; একটু আগেই ড্যান হোয়াইট্, শত্রুরা কতদূরে আছে জানবার জন্যে, বেয়োনেটের ডগায় নিজের টুপিটা চড়িয়ে উঁচু ক'রে ধরেছিল—সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তীর—অন্তত আটটা নটা হবে—এসে বিঁধল ওদের টুপিতে। অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়ে ড্যান বন্দুকটা নামিয়ে নিলে। এ দেখেও ওর বন্ধু পেনী—ঠিক কোথা থেকে ওরা তীর ছুঁড়েছে দেখবার জন্য কৌতূহলে গলাটি বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল, ব্যস! ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই একটা তীর পেনীর মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে হাত কতক দূরে গিয়ে পড়ল।

একটার পর একটা! প্যাটনের মন একটা প্রতিকারহীন ক্ষোভে এবং ব্যর্থ উষ্মায় ভরে যায়! যুদ্ধ করতে এসেছে ঠিকই, আর মৃত্যু ত যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল, বরং বলা চলে নিত্য-সহচর!

কিন্তু তাই বলে এই অকারণ প্রাণক্ষয়! তাজা, সুস্থসবল ছেলে-গুলো—বংশের আশা ভরসা—এমন ভাবে প্রাণ হারাবে!…এই অকারণ প্রাণক্ষয়ের প্রতিবাদ করতেই ত সেদিন হাতে পেয়েও তারা ছেড়ে দিলে সেই নেটিভটাকে।…না, শয়তানের ঝাড় সব! স্মিথের কথাই ঠিক, অমন ক'রে দয়া দেখানো ঠিক হয়নি ওদের!

সে একসময় মরীয়া হয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার হোপকে বললে, 'দেখুন কিছু কিছু ক'রে ত মরছিই আমরা, তার চেয়ে চলুন সবাই একসঙ্গে ওদের পাঁচিল ভাঙ্গবার চেষ্টা করি। কত আর মরবে? মরতে মরতেও যে কজন থাকবে—কাজ ফতে করতে পারবে। আপনি হুকুম দিন!'

হোপ বললেন, 'হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি। আর দেরি করা উচিত নয়। এতে শুধু অকারণ বলক্ষয়।…দেখি, স্যার কলিনকে একবার জিজ্ঞাসা করি—'

ব্রিগেডিয়ার হোপ চলে গেলেন স্যার কলিনের খোঁজে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্যাটন হোপের সঙ্গে দেখা করবে ব'লে খুঁজতে খুঁজতে বহু পিছনে এসে পড়েছিল-- গুলি ও তীরের সীমানার বাইরে এসে পড়েছে ভেবেই সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রকাশ্য জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিল। অকস্মাৎ অত দূরেই--একটি তীর এসে পৌঁছল। কিন্তু প্যাটনের গায়ে নয়—তীরটা ওর পায়ের কাছে মাটিতে এসে বিঁধল। ইচ্ছা ক'রে তীরের মুখ নিচু ক'রে না ছুঁড়লে এ ভাবে এসে বেঁধে না। এতদূরে যাঁর তীর আসে সে শক্তিমান এবং কুশলী তীরন্দাজ। এমন হাত নিচু ক'রে সে ছুঁড়বে না—যাতে এতটা হিসেবের ভুল হয়ে তীর মাটিতে এসে বেঁধে!

কৌতূহলী হয়ে প্যাটন তীরটা মাটি থেকে টেনে তুলল।

তীরের গায়ে খুব পাতলা একটি কাগজ জড়ানো—সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে বাঁধা।

কৌতূহল প্রবলতর হয়ে ওঠে। ব্যগ্র আগ্রহে কাগজটা খোলে প্যাটন। একটা পাতলা কাগজে আনাড়ী হাতে একটা নক্সা আঁকা—তাতে আর কিছু লেখা নেই। দেশি কালি দিয়ে নক্সা এঁকে বালি দিয়ে শুকোনো হয়েছে। কোন হিন্দুস্থানীর কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর অর্থ কি?

ততক্ষণে আরও দুচারজন কৌতূহলী হয়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওকে। কেউই কিছু বুঝতে পারল না। কেউ বললে, 'বোগাস।' কেউ বললে, 'বদ্‌মাইসী করেছে—আমরা আকাশপাতাল ভেবে মরব, সেই জন্যেই একটা রহস্যময় কিছু করতে চেয়েছে!' কেউ বললে, 'তামাসা!'

বিল মিচেলও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে অনেকক্ষণ নক্সাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্যাটন, আমার মনে হচ্ছে এটা শাহ্‌নজফেরই নক্সা—আর পিছনের এটা কদম-রসুল!···কনৌজীলাল কোথায়, তাকে ডাকো না কেউ—সে ত চেনে এধারের সব বাড়ীঘর!'

কে একজন ছুটে গেল কনৌজীলালকে ডাকতে। কিন্তু সে ঠিক তখন কোথায়—তা কেউ বলতে পারলে না।

মিচেল আরও একটু দেখে দেখে বললে, 'ছ্যাখো। এর ভেতর দিয়ে পরিষ্কার কোন খবর দিতে চেয়েছে কেউ—তা যে যা-ই বলুক!'

ওরা দু'তিনজনে আরও ভাল ক'রে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

পাশাপাশি দুটি ইমারতের নক্সা। হ'তে পারে কদম-রসুল আর শাহ্‌নজফ্। কিন্তু তার মানে কি?···আরও একটু ভাল ক'রে দেখতে দেখা গেল—এক জায়গায়, পাঁচিলের রেখার গায়ে একটা চিকে-কাটা। ঐ স্থানটার দিকে কেউ কোনও ইঙ্গিত করতে চেয়েছে!··

মিচেল বললে, 'সামনের এটা যদি শাহ্‌নজফ্ হয় ত— পিছনের এটা কদম-রসুল।···মাঝে এই ছাখো পগারটাও দেখানো হয়েছে। তাহ'লে এটা হ'ল শাহ্‌নজফের পাঁচিল—পিছনের দিককার মানে রসুলের দিককার পাঁচিল।

অকস্মাৎ প্যাটন একটা অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল—'ছাখো ছাখো বিল, এ পাশে একটা নাম-সই করা আছে। উর্দুতে। তোমরা উর্দু জানো কেউ?'

কাছাকাছি একজন শিখ ছিল, সে এসে অতিকষ্টে পড়লে, 'মোহন!'

'মোহন!'

বিল ও প্যাটন্—দুজনেই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে খানিকটা।

সেই মোহন কি?

তাহ'লে কি, অতদূর থেকে দেখতে পেয়েই প্যাটনকে কোন সংবাদ দিতে চেয়েছে সে?

কৃতজ্ঞতা, না চরম বিশ্বাসঘাতকতা?

প্যাটন হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে; 'দেখাই যাক্না। আমি ঘুরে দেখে আসছি—ওধারের পাঁচিলে কি আছে!'

ক্যাপ্‌টেন ডসন ডাক্তারের সহকারীরূপে আহতদের সেবা ক'রে

বেড়াচ্ছিলেন। তিনি এসে বললেন, 'অত দুঃসাহস ভাল নয় সার্জেণ্ট জন প্যাটন। এ নিশ্চয় ঐ শয়তান-ব্যাটাদের ফাঁদ।'

'দেখাই যাক্‌না। না হয় আমি একাই মরব।...এমনিও ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কত লোক মরছে!'

প্যাটন আর দাঁড়াল না। বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে গুঁড়ি মেরে মেরে লোকজন-কামানের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল সে, কোথাও বা বুকে-হেঁটেই যেতে হ'ল। অবশেষে এক সময় গিয়ে পড়ল শাহ্‌নজফের পিছন দিকের গভীর পরিখায়। খাড়া পাহাড়ের মত মাটি উঠে গেছে, তার ওপর পাঁচিল—কতকটা দুর্গের মতই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেদিকটায় তখন কেউ নেই! তবু মনে মনে ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করলে প্যাটন। যদি সত্যিই সবটা ফাঁদ হয়।

খানিকটা ওঠবার পরই ওপর দিক থেকে খুব চাপা-গলায় কে যেন ব'লে উঠল, 'সাহেব—আর একটু বাঁদিকে—তাকিয়ে দেখুন পাঁচিলটা।'

কণ্ঠস্বরটাও যেন পরিচিত মনে হ'ল। সেদিনের মত ভয়বিকৃত নয়, তবু চেনা যায় বৈকি! মোহনেরই গলা।

প্যাটন তাকিয়ে দেখল।

কখন ওদেরই একটা ন-পাউণ্ড গোলা শাহ্‌নজফের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ডিঙ্গিয়ে এধারের পাঁচিলে এসে পড়েছে। অনেকখানি ভেঙ্গে গেছে পাঁচিলটা—বেশ বড় রকমের একটা গর্ত হয়েছে তাতে। একটা মাঝারি দরজার মতই।

যতদূর দেখা যাচ্ছে এখানে কোন পাহারা রাখারও প্রয়োজন মনে করেনি সিপাহীরা। এদিক থেকে শত্রুর আশঙ্কা একেবারেই করে না ওরা।

মাটি দিয়ে গড়িয়ে সাপের মতই মাথা নিচু ক'রে এগিয়ে এল মোহন, খানিকটা কাছে এসে চুপি চুপি বললে—'দশ বারোজন লোক এসে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ুন সাহেব। বাঁ দিকের পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ফটকটা খুলে দিন! তাহ'লেই আপনাদের জয় অনিবার্য!'

তারপর একটু থেমে ম্লান হেসে বললে, 'নিজের জাতভাইয়ের সঙ্গে একরকম বিশ্বাসঘাতকতাই করলুম।···কিন্তু কী করব - প্রাণের দাম শোধ করতে হবে ত!'

সে আবার তেম্নি নিঃশব্দে এঁকেবেঁকে সরিসৃপের মতই উঠে চলে গেল।

শাহ্‌নজফ্‌ ইংরেজদের হস্তগত হয়েছে। অকস্মাৎ সামনে-পিছনে দুদিক থেকে শত্রুর আক্রমণে বিভ্রান্ত সিপাহীর দল পালাবারও অবকাশ পায়নি। বিরাট সমাধি মন্দিরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন অসংখ্য মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—বোধহয় দুহাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে আজ। হোক্‌ শত্রু—তবু এতগুলি মৃতদেহ দেখে মিচেলের মনটা কেমন যেন ভারি হ'য়ে উঠল।

তবু সে জন প্যাটনের সঙ্গে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বিস্তৃত সমাধি ভবনের প্রাচীরের গায়ে লাগা সারি-সারি ঘর—চারিদিকের গোটা পাঁচিলটা জুড়ে। এগুলো তৈরী হয়েছিল একদা রাহী বা যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য—এ ক-দিন সিপাহীরা ব্যারাকে

পরিণত করেছিল ঘরগুলোকে। কি আছে ঘরগুলোয়, কে কী ফেলে গেছে, কেউ এখনও লুকিয়ে আছে কিনা কোথাও—এই কৌতূহলে ওরা দুজন সব ঘরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

তার ফলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল ওদের। দেখা গেল এই পরাজয়ের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ওরা। বরং নিশ্চিন্ত হয়ে রসুইয়েরই আয়োজন করছিল। দু-তিন জায়গায় নৈশ আহার প্রস্তুতের ব্যবস্থা চোখে পড়ল। এক জায়গায় বিরাট আটার তাল এক পেতলের পরাতে, ডাল উনুনে চাপানো—সে ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। আর এক জায়গায় ডাল তখনও ফুটছে। কাঠপুড়ে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আঙ্গরার আঁচই যথেষ্ট। একটা ঘরে গোছা-করা চাপাটি প্রস্তুত, তার সঙ্গে হাণ্ডাভর্তি ডাল।

একটা ঘরে আরও এক বিস্ময় ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরের কুলুঙ্গীতে পূজার আয়োজন! চন্দনমাখা নুড়ি গোটাকতক—ফুলে ঢাকা। তার পাশে তখনও একটা চিরাগ জ্বলছে। অর্থাৎ কোন ভক্ত হিন্দু সিপাহী তার দেবতাকে ফেলে আসতে পারেনি এবং এখানেও নিত্য-পূজা অব্যাহত রেখেছিল!

মুসলমানের সমাধি-মন্দিরে হিন্দু দেবতার পূজা!

প্যাটন এবং মিচেল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে মুখচাওয়া-চাওয়ি করলে।

ঘরগুলোয় বসতির চিহ্ন প্রচুর থাকলেও বাসিন্দা আর একটিও নেই। কোথায় হয়ত ক্ষীণ আশা একটা ওদের ছিল যে কোন লুকিয়ে-থাকা ভীত শত্রুকে আবিষ্কার ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে বাহবা নেবে! কিন্তু সে দিক দিয়ে একেবারেই হতাশ হ'তে হ'ল। বোঝা গেল যে

ঘরে লুকিয়ে আত্মরক্ষার কথা কেউই ভাবেনি, পালাবারই চেষ্টা করেছে সকলে এবং তার ফলে বেশীর ভাগই মরেছে!

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে খুটি পুঁতে গোটা কতক মশাল বেঁধে দিয়েছে এরা। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী। তবু তারই ক্ষীণ আলোকে মৃতদেহগুলো দেখে দেখে বেড়াতে লাগল প্যাটন আর মিচেল। এদের মধ্যে যে দু-একজন স্কচ্ বা ইংরেজের দেহ ছিল তা অবশ্য এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে— তবু এখনও এক-আধটা অবশিষ্ট আছে কিনা— সেইটেই দেখছিল ওরা!

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ এক জায়গায় এসে দুজনে যেন একই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

সিপাইদের মৃতদেহের মধ্যে সাধারণ নাগরিকের মত সাদা জামা-কাপড় পরা একটা দেহ—

এ-দেশীয় কেউ ত বটেই - যদিচ মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না, উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে মশালের আলো মিশে যেন আব্‌ছায়ারই সৃষ্টি করেছে, তবু তারই মধ্যে হেঁট হয়ে দেখবার চেষ্টা করে ওরা। শেষে প্যাটন আস্তে আস্তে দেহটা উল্‌টে দেয়—

ওদের মনের মধ্যে যে সন্দেহটা অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল সেইটেই সত্য হয়ে ওঠে।

মোহন!

বেচারী মোহন!…

প্যাটন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবার।

'জীবনের দাম শোধ করতে গিয়েছিল বেচারী। কিন্তু সে জীবন কতটুকু?'

বিল আর কথা কইলে না। বোধ হয় কথা কইবার ক্ষমতাও ছিল না ওর। আশ্চর্য! দেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে এসে ঘৃণিত শত্রুদেরই একজনের জন্য তার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে তা কে জানত।

নিজের মনোভাবে নিজেই যেন বিস্মিত বোধ করে সে।

আর ঘুরতে ইচ্ছা করেনা কারুরই। যে ক্লান্তি বহুপূর্বেই বোধ করা উচিত ছিল ওদের সেই ক্লান্তিতে এবার পা যেন ভেঙ্গে আসে।

ওদের দলবল বেশীর ভাগই ততক্ষণে এক জায়গায় একটা আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে বিশ্রামের জন্যে। কোনমতে পা-দুটো টেনে টেনে ওরা সেইখানে এসে পৌঁছয়।

সেন্ট্রি-গ্রার্ডের হুকুম বেরিয়ে গেছে তখন। পেট্রোল গার্ডেরও। প্যাটনের ওপর পাঁচিল পাহারা দেবার ভার—৬টা থেকে ৮টা। মিচেলের পড়েছে পেট্রোল ডিউটি, আটটা থেকে দশটা। প্রত্যেকেরই দুঘণ্টা ক'রে। বাকী সময়টা বিশ্রাম। প্যাটন ছুটতে ছুটতে চলে গেল—ছটা বাজতে তখন মাত্র দুটি মিনিট বাকী। মনে মনে এই অবসরটুকুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে মিচেল মাঠের ওপরই এলিয়ে পড়ল।

আটটার সময় যখন একজন অফিসার ওকে জাগিয়ে দিলে তখন রীতিমত শীত বোধ হচ্ছে ওর। দিনের বেলা গরমে গ্রেট কোটটা বওয়া অসহ্য বোধ হচ্ছিল, তার ওপর এক সিপাহীর তলোয়ারে

অনেকখানিই কেটে গিয়ে ঝলঝল করে ঝুলছিল দেখে সেটা সে সময় টান মেরেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে। কিন্তু এখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড়ের মধ্যে অবধি কাঁপিয়ে তুলছে! আশ্চর্য, নভেম্বরেই এত শীত এখানে! অথচ দিনের বেলায় অত গরম! এদেশের সবই অদ্ভুত! সেই ছেঁড়া গ্রেট কোটটার জন্যেই এখন আফ্‌সোস হচ্ছে, যদি সেটাও থাকত!

বিল মিচেল শীত তাড়াবার জন্যে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল— ভাগ্যিস সেন্ট্রি ডিউটি পড়েনি ওর! পেট্রোল ডিউটিতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ আছে তবু।...

সকলেই ঘুমন্ত—শুধু পাহারাদাররা ছাড়া। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি।

ঘুম এবং শীত দুই-ই দূর করতে মিচেল তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মনকে সচেতন ক'রে তোলে।

বিরাট সমাধি গৃহটার দিকে তাকায়।

প্রকাণ্ড গম্বুজ—মস্‌জিদের ধরণে। তার নিচে উঁচু পোতার ওপর সমাধি বেদী। কিন্তু সেটা আসল সমাধি নয়। এদেশের এই এক মজার নিয়ম। ওপরে প্রায় একতলা কি দেড়তলা সমান উঁচু জায়গায়— বাহারী নকল সমাধি একটা। অথচ তারই বেশী জাঁক-জমক—বেশী রূপসজ্জা। তার নিচে অব্যবহার্য একতলাটায় মাটিতে আসল সমাধি—সম্পূর্ণ আড়ম্বর ও সাজসজ্জা-বর্জিত। সেটাতেও ঢোকা যায়, কিন্তু দেখবার কিছু নেই ব'লেই কেউ ঢোকেনা। রক্ষকরা সন্ধ্যার সময় একটা ক'রে চিরাগ জ্বেলে দিয়ে যায় এই মাত্র। বিদ্‌রীর কাজ করা বড় লণ্ঠনটাও জ্বলে ওপরের নকল সমাধিতে, সেইখানেই

দর্শকরা ফুল দিয়ে যায়, আলো দিয়ে যায়—সিন্নির পয়সা ফেলে। বেশীর ভাগ দর্শক এবং যাত্রীই ঐ সমাধিটা দেখে ফিরে যায়, নিচের তলার কথা কারুর মনেও পড়েনা।

এসবই এই ক' মাসে মিচেল জেনেছে। এদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছে ওর।

সে ঘুরতে ঘুরতে সেই নিচের তলার অন্ধকার বিরাট মূল সমাধি-গৃহটার প্রবেশপথে এসে থমকে দাড়ায়। অন্ধকারে ভেতরটা থমথম করছে। আরও বেশী ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, পাথরের ঐ ঘরটা।···

কী অদ্ভুত এদের নিয়ম!

ভাবতে ভাবতেই আবার এগিয়ে যায় বিল মিচেল। কিন্তু ঠিক কোণে গিয়ে যেমন বাঁ-হাতি ঘুরতে যাবে হঠাৎ একেবারে ঘাড়ে পড়ে যায় একজনের। কে একজন গুঁড়ি মেরে দেওয়ালের আড়ালে' বসে আছে—

অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালি দিয়ে উঠে নিমেষে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে মিচেল!

'কে, কে এখানে!'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে হাসে। বহুদূরে মশালের আলো—তবু চিনতে খুব অসুবিধে হয় না—সার্জেণ্ট স্মিথ!

'এখানে এভাবে বসে কি করছিলে?'

বেশ রূঢ়কণ্ঠেই প্রশ্ন করে মিচেল।

'তোমাদের প্রণয়লীলা দেখছিলুম কর্পোরাল বিল মিচেল। কেন, ব্যাঘাত করলুম নাকি? আমার অস্তিত্ব টের পেয়েই মাল ছেড়ে চলে এলে নাকি?'

'তোমার রসিকতা বোঝা কঠিন সার্জেন্ট স্মিথ! প্রণয় করব কার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে না ঐ নেটিভদের মৃতদেহগুলোর সঙ্গে?'

'কেন—সেদিন যার চাঁদমুখ দেখে মোহিত হয়েছিলে, যাকে চুপি চুপি ঐ অন্ধকার ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছ! ছাখো বিল, আমার বয়স হয়েছে—আমি কচি খোকা নই—অত সহজে আমাকে ধাপ্পা দিতে এসো না।'

'তার মানে?' বিল মিচেলের কণ্ঠস্বর ভীষণ শোনায়।

'তার মানে সেদিনকার সেই মেয়েটা। একটু আগেই নিচের ঐ গোরটার মধ্যে ঢুকেছে।'

'মিছে কথা! সে এখানে কী ক'রে আসবে?'

'গিয়ে ছাখো। আমি যে কোন শপথ করতে রাজী আছি! মিছে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই, তোমার মন দারুণ উত্তেজিত হয়েছে বলে জানি তাই—অপরে মিথ্যাবাদী বললে সহজে ক্ষমা করতুম না।…আচ্ছা আসি, গুড্ নাইট!'

খুব চাপা গলায় শিস্ দিতে দিতে চলে যায় সে।

সম্ভবত এইবার ওর ডিউটি পড়বে কোথাও—কিম্বা বিশ্রামের কথাই মনে পড়ে এতক্ষণে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিল মিচেল।

কথাটা কি সত্যি? না, না, এই যুদ্ধক্ষেত্রে, এই মৃত্যুপুরীতে সে কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু স্মিথ যেভাবে বললে—

যদি সত্যিই হয়—মেয়েটাকে তার কয়েদ করা উচিত।

শত্রুর গুপ্তচর হ'তে পারে। এদের বিশ্বাস নেই।...

গিয়ে দেখতে দোষ কি ?

এদিক ওদিক চেয়ে একটা খুঁটি থেকে জ্বলন্ত মশাল তুলে নেয় বিল মিচেল। তারপর সেটা বাঁহাতে বাগিয়ে ধরে ডানহাতে বেয়নেট সুদ্ধ বন্দুকটা উঁচিয়ে সাবধানে এগিয়ে যায় সে সমাধি মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে।

ঠিক দরজাটার সামনে গিয়ে মুহূর্তকাল বোধহয় ইতস্তত করে সে। ওর মনে হয় খুব দূরে পিছনে কে যেন চাপা গলায় হাসছে—বিদ্রূপের হাসি। এত মৃদু যে ঠিক শুনেছে কিনা তাও বুঝতে পারে না, মনে হয় বুঝি কল্পনা।

সে মন দৃঢ় ক'রে সোজা ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে !

'সাহেব সাহেব, এগিও না, সর্বনাশ ক'রো না—'

পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে চাপা অথচ আকুলকণ্ঠে কে যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে। মশালের আলোটা নিজের হাতে ধরা ব'লে সহজে কিছু নজরে পড়ে না। শুধু চকিতে যেন দেখে ঘরের মেঝেতে মাঝখানে স্তূপাকার করা কালো মত কী একটা চূর্ণ পদার্থ—এবং তার সামনে শাড়ীপরা বিবর্ণমুখী একটি মেয়ে !

তারপর হতভম্ব স্তম্ভিত বিল মিচেল ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই সেই মেয়েটি ছুটে এসে দুহাত দিয়ে জ্বলন্ত মশালের মাথাটা চেপে ধরে।

'একি একি, এ কী করছ ?'—বলতে বলতেই মিচেল মশালটা ধরে টানাটানি করে।

'আঃ, সাহেব ছেলেমানুষী করো না। মশালটা আগে নিভোতে

দাও, তারপর যা খুশী করো। আমাকে মেরে ফেলো, আমি একটা কথাও কইব না।'…

'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'সাহেব তোমার পায়ের তলায় বারুদ—কয়েক গাড়ী বারুদ। একটু আগুনের ফুল্‌কী লাগলে তুমি আমি, ঐ-সব সাহেব, এই ইমারত কিছু থাকবে না। সব উড়ে যাবে!'

'বারুদ!' স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুর মিচেলের কণ্ঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় ঝাপ্‌সা-দেখা একটা কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থের রাশি—

ততক্ষণে মশাল নিভে গেছে। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। প্রবেশ-পথ দিয়ে বাইরের স্বল্প কয়েকটি আলোর ক্ষীণ আভা মাত্র এসে পড়েছে।

তারই মধ্যে মেয়েটাকে সরিয়ে বিল আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে একটুখানি সেই গুড়ো তুলে নেয় হাতে ক'রে। নাকের কাছে ধরতেই আর সন্দেহ থাকে না বিন্দুমাত্রও। বারুদ—এবং এই স্তূপাকার বারুদে একটি মাত্রও আগুনের ফুল্‌কী লাগলে এতগুলি প্রাণীর কারও রক্ষা থাকত না।

'কিন্তু তুমি যে—কৈ চলো ত দেখি!'

বিল মিচেল মেয়েটার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'দেখি তোমার হাত!'

গঙ্গু কোন বাধাই দেয় না। তার চোখের কোলে সদ্য-বিসর্জিত অশ্রুর আভাস থাকলেও, মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা। বিল তাকে

আরও খানিকটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটা মশালের সামনে দাঁড় করিয়ে তার ছুটো হাত আলোর সামনে উঁচু ক'রে ধরে। 'ইস্, যা ভেবেছি তাই—ছুটো হাতই যে একেবারে পুড়ে গেছে। এ কী করলে গঙ্গু?'

'নইলে তোমাকে বাঁচাবার যে আর কোন উপায় ছিল না সাহেব। আমি ত খুশি মনেই মরতে পারতাম। সে হ'ত আমার সুখের মৃত্যু!'

'আমাকে বললে না কেন মুখে?—ছি ছি, ছুটো হাতই কী ভাবে পুড়লো বলো ত!'

'তোমাকে বলে বুঝিয়ে বাইরে আনতে গেলে যে সময় যেত—হয়ত তুমি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে, টানাটানি করতে মশাল নিয়ে—হয়ত হেঁট হয়ে দেখতেই যেতে—তার মধ্যে একটি ফুল্‌কী খসে পড়লে কি হ'ত? কিম্বা জ্বলন্ত এক ফোঁটা তেল।'

'বুঝেছি গঙ্গু—তুমি আমার আজ প্রাণ দান করেছ। সেদিন আমি যা করেছি তা সামান্যই, তুমি আজ তার অনেক বেশী দিলে!'

'না সাহেব। সে কথা নয়। তোমার প্রাণ বেঁচেছে, এইজন্যই গঙ্গামাঈকে ধন্যবাদ। আমাদের এ প্রাণের কী মূল্য। তোমাদের মত লোক বাঁচলে বহুলোকের উপকার হবে!'

'কিন্তু—কিন্তু তুমি এই মৃত্যুপুরীতে কেমন ক'রে এলে গঙ্গু?'

গঙ্গুর ছুই চোখের কোল বেয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়ল ঝর ঝর ক'রে। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কোনমতে বললে, 'মোহন ভাইয়াকে খুঁজতে এসেছিলাম। আমি অভাগীই সেদিন তাকে বলেছিলাম তোমাদের ওপর নজর রাখতে, সাধ্যমত তোমাদের উপকার করতে—তাই সে এদের সঙ্গে এখানে এসেছিল, নইলে কৈশারবাগে তার থাকবার

কথা। ওকে এইখানে পাঠিয়েও স্থির থাকতে পারি নি, নিজে এসে কদম-রসুলে লুকিয়ে ছিলুম। ছেলেবেলায় আমার বাবা এই পাড়ায় থাকতেন, এইখানেই খেলা করেছি, এখানকার পথঘাট সব আমার চেনা। কদম-রসুল আর এখানের মধ্যে একটা গুপ্ত পথও আছে। সন্ধ্যাবেলা যখন দেখলুম আমাদের সেপাইরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—আর কেউ নেই, তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না—এখানে চলে এলুম। আঁধারে আঁধারে গোপনে গোপনে ঘুরছিলুম, তারপর একসময় মোহনকেও পেলুম!'

কান্নার আবেগে গঙ্গুর গলা একেবারেই বুজে এল। খানিক পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমার জন্যই এই কাণ্ডটি হ'ল! মনে হ'ল অসংখ্য সঙীন্ পড়ে রয়েছে আশেপাশে, একটা তুলে বসিয়ে দিই বুকে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক্। কিন্তু তারপরই মনে প'ড়ল, ওর বৌ-ছেলের কথা, আমার বুড়ো মায়ের কথা। তাদের যে আর কেউ রইল না। তাই চোখের জল মুছে আবার উঠে দাঁড়ালাম। সেই মুহূর্তে সেদিনকার সেই যমদূতের মত সাহেবটা কোথা থেকে এসে পড়ল। ভাবলাম বুঝি আজও অপমান করবে কি ধরিয়ে দেবে—কিন্তু কিছুই করল না। বললে শুধু, আমি বড়ই দুঃখিত। তোমার আত্মীয় মারা গেছে। তা ও শেষ অবধি আমাদের উপকারই করেছিল সেজন্য তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার সেদিনকার সেই সাহেব, সে-ই তোমাকে দেখেছে আগে। সে ঐ ঘরটার মধ্যে অপেক্ষা করছে, তুমি একবার দেখা ক'রে যেও! আমি তার মিষ্টি কথায় ভুললাম। সত্যিই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয়েছিল মনে মনে—তা

স্বীকার করছি। সব ভুলে এই ফাঁদে পা বাড়ালুম। অন্ধকারে ঢুকে তোমাকে চুপি চুপি ডাকলুম—মনে হ'ল কে যেন সাড়া দিলে। …এখন বুঝছি সেটা প্রতিধ্বনি। তখন তা মনে হয় নি, অন্ধভাবে এগিয়ে গিছলাম।…হঠাৎ পায়ে লাগল ঐগুলো, পড়েও গেলাম পা বেধে—তখনই গন্ধটা নাকে এল। সারাদিন এইখানে রয়েছি বলতে গেলে—বারুদের গন্ধ চিনতে ভুল হয় নি। বেরিয়ে আসতে যাবো, দেখি তুমিও ঢুকছ!'

থেমে থেমে থতিয়ে থতিয়ে এতগুলো কথা ব'লে যেন শ্রান্তিতেই চুপ করে গঙ্গু। তারপর আবার বলে, 'এখন বুঝছি ঐ লোকটারই শয়তানী। তোমার আমার দুজনের ওপরই শোধ তুলতে চেয়েছিল।'

মিচেল বলে, 'ঐখানে ডাক্তার আছেন, চলো গঙ্গু—তোমার হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিই গে—'

'না না। মাপ করো সাহেব। আমাকে ছেড়ে দাও। ও কিছু না। তুমি যেন শান্তিতে থাকো, নিরাপদে থাকো—এইটুকুই আমি প্রতিদিন জানাবো ভগবানকে। কিন্তু আর আমাকে নিয়ে বিব্রত হ'তে হবে না সাহেব। আমি চললুম—'

'চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই—নইলে যদি কেউ ধরে আবার!'

'দরকার হবে না সাহেব। আমি সেই গুপ্তপথেই ফিরে যাবো, যে পথে এসেছি! আর ধরে, এবার উপায় রেখেছি সঙ্গেই।'

সে কোমরের মধ্যে থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখায়।

'কিন্তু গঙ্গু, আমি কি তোমার কোন উপকারে লাগতে পারি না। টাকা কড়ি—? তোমার ঠিকানাটাও ত আমাকে জানালে না। এ লড়াই মিটে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম!'

গঙ্গু একবার মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। কেমন যেন উৎসুক, লুব্ধ দৃষ্টিতে চায়, ইতস্তত করে খানিকটা, বোধহয় কি বলতেও চেষ্টা করে তারপর হঠাৎ একসময়ে সে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই মিচেল আর কিছু বলবার বা বাধা দেবার আগেই, সে ছুটে সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশে যায়।

বিল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে বহুক্ষণ ধরে। ওর গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠতে চাইছে। এ মনোভাবের সঙ্গে ওর এর আগে কখনও আর পরিচয় হয় নি। অবস্থাটা একেবারে অভূতপূর্ব !